সুন্দরবনে সাত বৎসর

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

১. মকরসংক্রান্তি......3
২. কেওড়া গাছ......30
৩. শিশির-ভেজা......67

১. মকরসংক্রান্তি

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ সরকার টেলিফোন–সাউথ ৯৩২
১৫৪, হরিশ মুখুজ্যে রোড ৭২, বকুলবাগান রোড
কলিকাতা–২৫ কলিকাতা-২৫
১৫/১০/৫২

প্রীতিভাজনেষু,
সুন্দরবনে সাত বৎসর বইখানি খুব ভালো লাগল, লেখা ছবি ছাপা কাগজ সবইউত্তম। ছোটো ছেলে-মেয়েরা অ্যাডভেঞ্চার পড়তে ভালোবাসে। এরকম রচনা রূপকথা বা ডিটেকটিভ গল্পের চাইতে হিতকর মনে করি, কারণ, পড়লে মনে সাহস হয়, কিছু জ্ঞানলাভও হয়। সাহসিক অভিযান বা বিপদসংকুল ঘটনাবলির জন্য আফ্রিকায় বা চন্দ্রলোকে যাবার দরকার দেখি না, ঘরের কাছে যা পাওয়া যায় তার বর্ণনাই বাস্তবের সঙ্গে বেশি খাপ খায় এবং স্বাভাবিক মনে হয়। সুন্দরবন রহস্যময় স্থান, নিসর্গশোভা নদী সমুদ্র নানারকম গাছপালা বন্যজন্তু আর সংকটের সম্ভাবনা সবই সেখানে আছে। এই সবের বর্ণনা এবং চিত্র থাকায় আপনার বইখানি অতি চিত্তাকর্ষক হয়েছে। যাদের জন্য লিখেছেন তারা পড়লে খুব খুশি হবে সন্দেহ নেই।

ভবদীয়
রাজশেখর বসু

.

মাঘ মাসে মকরসংক্রান্তি উপলক্ষে সাগরদ্বীপে প্রতি বৎসরই একটি খুব বড়ো রকমের মেলা বসিয়া থাকে। মকরসংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর-স্নান করিতে তখন নানাদেশের লোক আসিয়া জড়ো হয়। এইস্থানে সমুদ্রের সহিত গঙ্গার মিলন হইয়াছে, এইজন্য ইহা একটি তীর্থস্থান। প্রতি বৎসর হাজার হাজার লোক বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং নেপাল ও পাঞ্জাব প্রভৃতির দূর দেশ হইতেও এইখানে এই যোগ উপলক্ষে আসিয়া থাকে। বহু সাধুসন্ন্যাসীরও সমাগম হয় এবং মেলায় নানাদেশ হইতে ব্যবসায়ী লোক আসিয়া উপস্থিত হয়।

সমুদ্রতীরে বিস্তীর্ণ বালুকারাশির উপর এই বৃহৎ মেলাটি বসিয়া থাকে। তীর্থের কাজে তিন দিনের বেশি লাগে না বটে, কিন্তু মেলাটি চলে অনেক দিন। যাত্রীরা ভোরে উঠিয়া সাগরে স্নান করে; তারপর পঞ্চরত্ন দিয়া সাগরে পূজা করিয়া কপিল মুনির মন্দিরে গিয়া মুনির প্রতিমূর্তি দর্শন করে এবং সেখানেও পূজা দেয়। মন্দিরের বাহিরে একটি বটগাছ আছে, তাহার তলায় রাম এবং হনুমানের মূর্তি এবং কপিল মুনিরও একটি

মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের পিছনে একটি কুন্ড আছে তাহার নাম সীতাকুন্ড। যাত্রীরা পান্ডাদিগকে পয়সা দিয়া এই কুন্ডের এক বিন্দু জল প্রত্যেকেই পান করিয়া থাকে। কপিল মুনির মন্দিরের ভিতর যাইতেও প্রত্যেক যাত্রীকে চারি আনা করিয়া দিতে হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, সমুদ্রতীরে বিস্তীর্ণ বালুকারাশির উপর এই মেলাটি বসিয়া থাকে। মেলার জন্য যে-সমস্ত কুঁড়েঘর তোলা হয়, তাহা ছাড়া কোনো ঘরবাড়ি এখানে নাই; অন্তত আমরা যে-সময়ের কথা লিখিতেছি, সেসময়ে দেখি নাই। সুতরাং, নৌকা ভিন্ন অন্য কোনো আশ্রয় যাত্রীদিগের ছিল না। তখন স্টিমার ছিল না, যাত্রীদিগকে নৌকা করিয়াই গঙ্গাসাগরে যাইতে হইত। কিন্তু সেই তীর্থস্থানে নৌকায় বাস করা অপেক্ষা, সেই অনাবৃত বালুকারাশির উপর শয়ন করিয়া রাত্রিযাপন করায় বেশি পুণ্য বলিয়া অনেকে তাহাই করিত!

তীর্থস্থানে অনেকে যেমন পুণ্য সঞ্চয় করিতে যায়, তেমনি অনেকে আবার কু-মতলবেও গিয়া থাকে। একদিকে যেমন সাধু-সন্ন্যাসীরা আসেন, অন্য দিকে তেমনি চোর-ডাকাতেরও অভাব থাকে না। আমরা যে-সময়ের কথা লিখিতেছি, সেসময় দেশে চোর-ডাকাতের অত্যন্ত উপদ্রব ছিল।

তখন আমার বয়স বড়ো বেশি নয়। আমি দাদামহাশয়ের সহিত গঙ্গাসাগর গিয়াছিলাম। দাদামহাশয় সাগরে গিয়াছিলেন পুণ্যস্নানে; আমি গিয়াছিলাম মেলা দেখিতে। বাড়ির কাহারও ইচ্ছা ছিল না যে আমি যাই এবং দাদামহাশয়ও আমাকে প্রথমটা সঙ্গে লইয়া যাইতে রাজি হন নাই। কিন্তু আমি জেদ ধরিয়া বসিলাম–যাইবই। জানিতাম, আমার আবদার কখনোই অপূর্ণ থাকে না। যখনই যে-আবদার করিতাম, তাহা যতই কেন অসংগত হউক না, যতই কেন অসম্ভব হউক না, তাহা অপূর্ণ থাকিত না। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছিল যে, ন্যায্য আবদার ছাড়িয়া ক্রমে আমি নানাপ্রকার অন্যায় আবদার করিতে সাহসী হইয়াছিলাম। যদি প্রথম হইতেই আমার জেদ বজায় না থাকিত, যদি প্রথম হইতেই একটু শাসন হইত তাহা হইলে আমি অত আবদারে হইতাম না। কিন্তু যখন দেখিলাম, আমি যখনই যে জেদ করি, তাহাই বজায় থাকে; যে আবদার করি, তাহাই পূর্ণ হয় তখন আমার সাহস বাড়িয়া গেল। সে যাহা হউক, আমি তো জেদ করিয়া বসিলাম–যাইব-ই; হইলও তাহাই। দাদামহাশয় আমাকে ফেলিয়া যাইতে পারিলেন না।

যথাসময়ে গঙ্গাসাগরে আমাদের বজরা আসিয়া পৌঁছিল। সাগরযাত্রীদের নৌকাগুলি যেখানে সারি সারি বাঁধা ছিল, আমাদের বজরা সেইখানে বাঁধা হইল। ছোটো-বড়ো অনেকগুলি নৌকা সেখানে ছিল বটে, কিন্তু বজরা আর একখানিও ছিল না। তাই

আমাদের বজরা লাগিবামাত্র দলে দলে লোক আসিয়া আমাদের বজরা দেখিতে লাগিল। যাহাদের কাজকর্ম আছে, তাহারা একটু দেখিয়াই চলিয়া গেল। আর যাহাদের কাজকর্ম নাই, তাহারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শেষে বসিল; বসিয়া বসিয়া বজরার আকৃতি সৌন্দর্য সম্বন্ধে অনেক সমালোচনা করিল। বজরার মালিক যে একজন খুব বড়োলোক, সে-সম্বন্ধে সকলেই একমত হইল এবং একজন যে খুব বড়োলোক সাগরস্নানে আসিয়াছে, অল্পক্ষণ মধ্যে সে-সংবাদটা প্রচার হইয়া গেল।

আমরা বজরা হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম, বহু নিষ্কর্মা লোক এবং ভিক্ষুক বজরার কাছে জড়ো হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা তীরে উঠিলাম। দাদামহাশয় একজন বিশ্বস্ত লোকের হাতে আমার ভার দিয়া নিজে তীর্থকার্য করিতে গেলেন। আমি সেই লোকটির সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মেলা দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

দাদামহাশয় সমস্ত দিন তাঁহার নিজের কাজ লইয়া থাকিতেন, আমি কী করিতাম না করিতাম তাহা দেখিবার তাঁহার অবসর ছিল না। আমি সমস্ত দিন মেলায় ঘুরিয়া বেড়াইতাম। মেলায় যে কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতাম, তাহা নয়। দাদামহাশয়ের হুকুম ছিল, আমি যখন যাহা চাহিব, তখনই তাহা দিতে হইবে। সুতরাং, আমার খুব মজা। আমি নাগরদোলায় চড়িতাম, যাহা খুশি কিনিতাম–তিন দিন কী আনন্দেই না কাটাইয়াছিলাম! কেবল সেই তিন দিনের মধ্যে মেলায় যে-সমস্ত জিনিস আসিয়াছিল, এটা-ওটা করিয়া তাহার প্রায় সমস্ত জিনিসের অন্তত এক-একটি করিয়া আমি সংগ্রহ করিয়া লইলাম।

আমার চলাফেরা এবং ভাবগতিক দেখিয়া সকল লোকই আমাকে লক্ষ করিত এবং অনেক নিষ্কর্মা লোক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিত। আমরা যেদিন সেখানে পৌঁছিলাম, তাহার পরদিন হইতে দেখিলাম, মগের মতো চেহারা একটা লোক, প্রায় সমস্ত দিনই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিল। কিন্তু সে-লোকটি অন্যান্য লোকের মতো আমাদের কাছে কাছে বড়ো থাকে নাই এবং কোনো কথাও আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করে নাই, দূরে দূরে থাকিয়া আমাদিগকে লক্ষ করিতেছিল। পরদিন আমরা মেলায় গিয়া সে-লোকটাকে আর দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু একটি মগ বালক সেদিন আমার সঙ্গ লইল। সে ছিল আমার সমবয়সি। সুতরাং, অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহার সহিত আমার বেশ ভাব হইয়া গেল। মেলায় বেড়াইতে সে সেই স্থানের অনেক বিবরণ আমাকে দিল, অনেক গল্প করিল এবং আমাদের বাড়িঘরের কথাও জিজ্ঞাসা করিল। ছেলেটিকে আমি মেলা হইতে কয়েকটা জিনিস কিনিয়া দিলাম এবং সন্ধ্যার সময় বজরায় ফিরিলাম। মনে পড়ে ছেলেটি আমার সঙ্গে সঙ্গে বজরা পর্যন্ত আসিয়াছিল; আমি বজরায় উঠিলে সে ফিরিয়া যায়। এই মগ বালকটির উপর আমার কেমন একটু মায়া হইয়াছিল, আমি বজরার ভিতরে যাইয়া, সে চলিয়া গিয়াছে কিনা দেখিবার জন্য

তীরের দিকে চাহিলাম। চাহিয়া দেখি, সেই বালকটি তীরের কিছু দূরে পূর্বদিনের সেই লোকটার সঙ্গে দাঁড়াইয়া কী যেন কথা কহিতেছে। মগ বালকটির উপর সেদিন আমার যেমন একটু মায়া হইয়াছিল, সেই লোকটার প্রতি তেমনি পূর্বদিন আমার কেমন একটা বিরক্তি জন্মিয়াছিল। তাই সেই মগ বালককে লোকটার সহিত কথা কহিতে দেখিয়া আমার কেমন যেন ভালো বোধ হইল না।

যাহা হউক পরদিন প্রাতঃকালে আমাদের বাড়ি ফিরিবার কথা; সুতরাং তাহার বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। দাদামহাশয় সন্ধ্যার সময় আসিয়া বলিয়া গেলেন যে, তিনি সমস্ত রাত্রি কপিল মুনির মন্দিরে বসিয়া জপ-তপ করিবেন, ভোরে বজরায় ফিরিয়া আসিবেন এবং তখনই বজরা খোলা হইবে।

সন্ধ্যার পরেই আমাদের খাওয়া শেষ হইল এবং সমস্ত দিনের ক্লান্তির পর অল্পকাল মধ্যেই আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না। হঠাৎ কী একটা শব্দে আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। অন্ধকারে জাগিয়া অকারণেই কেমন যেন একটু ভয় ভয় করিতে লাগিল। রাত্রি প্রভাত হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য আমি বজরার এক ধারের জানালা তুলিয়া তীরের দিকে চাহিলাম, কিন্তু এ কী, তীর কোথায়! চাহিয়া দেখিলাম, যত দূর দৃষ্টি যায়, কেবল জল! নদীর দিকের জানালাটা খুলিয়াছি মনে করিয়া, ফিরিয়া গিয়া অন্য দিকের জানালাটা খুলিলাম; দেখিলাম,–সেদিকেও তাহাই, চারিদিকেই জল, কূলকিনারা নাই। বড়ো ভয় হইল। আমার যিনি অভিভাবক ছিলেন তাঁহাকে ডাকিলাম এবং তিনি উঠিলে তাঁহাকে সমস্ত বলিলাম। তিনি আমার কথা শুনিয়া বাহিরে গেলেন, গিয়া দেখিলেন–সত্যসত্যই বজরা আর তীরের কাছে বাঁধা নাই, অকূল সমুদ্রে ভাসিয়া চলিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ মাঝিদিগকে ডাকিয়া তুলিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন বুঝি কোনো প্রকারে বজরার বাঁধন খুলিয়া গিয়াছে এবং সেইজন্য বজরা স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। মাঝিরা তাড়াতাড়ি উঠিল এবং উঠিয়া যাহা দেখিল তাহাতে একটু ভীত হইল। একজন মাঝি তাড়াতাড়ি হালের দিকে যাইবে, এমন সময় হালের নিকট হইতে কে অতি কর্কশ কণ্ঠে কহিল, খবরদার, কেউ এক পা নড়েছ কী মরেছ?

মাঝি চাহিয়া দেখিল, হালের কাছে তিনজন লোক তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া আছে! ওদিকে বজরার সম্মুখের দিকে ছয়-সাতজন লোক নিঃশব্দে বসিয়াছিল, তাহারাও এই কথায় উঠিয়া দাঁড়াইল। রাত্রির ক্ষীণ আলোকে আমি নৌকার ভিতর হইতে দেখিলাম, তাহাদের প্রত্যেকের হাতেই তলোয়ার রহিয়াছে। আমার অভিভাবক তাড়াতাড়ি আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, সর্বনাশ হয়েছে, আমরা আরাকানী দস্যুদের হাতে পড়েছি।

www.bengaliebook.com

ডাকাতের হাতে পড়িয়াছি শুনিয়া আমার সর্বাঙ্গ হিম হইয়া গেল। আমি আর কথা কহিতে পারিলাম না। বজরায় আমাদের সঙ্গে দুইজন বরকন্দাজ ছিল। তাহারাও ঘুমাইতেছিল। গোলমালে ঘুম ভাঙিয়া যাওয়াতে, কোন হ্যায়রে, কোন হ্যায়রে–বলিতে বলিতে তাহারাও উঠিল। উঠিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে মুহূর্তের জন্য তাহারাও একটু থতমতো খাইয়া গেল। কিন্তু সে মুহূর্ত মাত্র, পরমুহূর্তে তাহারা তলোয়ার খুলিয়া বজরার দরজা চাপিয়া দুইজনে দাঁড়াইয়া বলিল, খবরদার, এদিকে এসো না, যতক্ষণ হাতে তলোয়ার আছে, ততক্ষণ কারো সাধ্যি নেই যে মনিবের চুলটিও স্পর্শ করে। আমাদের নৌকায় ছয়জন মাঝি, দুইজন বরকন্দাজ, দুইজন চাকর, আমার অভিভাবক ও আমি। এদিকে ডাকাতেরা প্রায় সাত আটজন। বরকন্দাজের কথা শুনিয়া একজন ডাকাত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, অকূল সমুদ্রে রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে সেই বিকট হাসি আকাশে প্রতিধ্বনিত হইল; সে-হাসিতে আমার বুকের রক্ত যেন শুকাইয়া গেল। পরমুহূর্তেই অস্ত্রের ঝনঝনা আমার কানে গেল। চাহিয়া দেখি, উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে বরকন্দাজদের তলোয়ারের আঘাতে দুইজন দস্যু জলের মধ্যে পড়িয়া গেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই আমাদের একজন বরকন্দাজও দস্যুদের হাতে প্রাণ হারাইল। আমি ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিলাম, তারপর আবার এই ভয়ানক দৃশ্য চোখের উপর দেখিয়া আমার চক্ষু আপনি মুদ্রিত হইয়া আসিল। ক্রমে যেন চেতনা হারাইলাম। তারপর কী হইল, তাহা আর কিছুই জানিতে পারিলাম না।

কতক্ষণ চেতনাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম জানি না, যখন চেতনা হইল, তখন ধীরে ধীরে চাহিলাম। চাহিয়া দেখিলাম, আমাদের সে বজরাও নাই, সঙ্গের লোকজনও নাই। একখানি খোলা নৌকার উপর আমি শুইয়া রহিয়াছি। রাত্রি তখন প্রভাত হইয়াছে। আমি ধীরে ধীরে নৌকার উপরে উঠিয়া বসিলাম। উঠিয়া দেখি, একটা খালের মধ্য দিয়া নৌকাখানি যাইতেছে। সেখানি ছিপ নৌকা। ছিপটি বহিতেছিল আট-দশজনখুব বলিষ্ঠকায় লোক। কাজেই ছিপখানি তিরবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই খালের দুই কূলে এত ঘন জঙ্গল যে সূর্যের কিরণও তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। আমি সেই অল্প আলোকে যাহা দেখিলাম, তাহাতেই বুঝিতে পারিলাম যে, ইহারা গত রাত্রের সেই আরাকানি দস্যুদল। আমাদের বজরা লুঠপাট করিয়া ইহারা আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। আমি উঠিয়া বসিবামাত্র পশ্চাৎ দিক হইতে কে একজন বলিয়া উঠিল, কী গো বাবু, ঘুম ভাঙল? সেই কথায় ফিরিয়া চাহিয়া আমি দেখিলাম, যে-লোকটি মেলায় আমাদের সঙ্গ লইয়াছিল– এ সে-ই! তখন আমি সব বুঝিতে পারিলাম। মেলায় আমার চলাফেরা ভাবগতিক দেখিয়া সকলেই মনে করিয়াছিল যে, আমরা খুবই বড়োলোক। এ লোকটাও তাহাই মনে করিয়া আমাদের সঙ্গ লইয়াছিল এবং দূরে দূরে থাকিয়া খোঁজখবর লইতেছিল। পরদিন যে মগ বালকটি আমার সঙ্গে ফিরিতেছিল এবং যাহাকে শেষে আমি ইহার

সঙ্গে কথা কহিতে দেখিয়াছিলাম, সেও বোধ হয় ইহাদেরই লোক এবং বোধ হয় ওই উদ্দেশ্যেই আমার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দিন ফিরিতেছিল। তখন সেই মগ বালকটির সঙ্গে অত ভাব করিয়াছিলাম বলিয়া মনে অনুতাপ হইল।

সেই লোকটার কথায় কোনো উত্তর না দিয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাদের বজরা কোথায়, আমাদের লোকজন কোথায়, তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? যাব না আমি তোমাদের সঙ্গে, তোমরা আমাকে আমার সঙ্গীদের কাছে দিয়ে এসো। এই কথা শুনিয়া ছিপের লোকগুলি সকলেই একসঙ্গে বিকট রবে হাসিয়া উঠিল। সে-হাসিতে আমি চমকিয়া উঠিলাম। তোমরা হয়তো মনে করিতেছ, হাসির রবে আবার চমকায় কে? কিন্তু তোমরা নিশ্চয় তেমন বিকট হাসি শুনো নাই, তাই ও-কথা মনে করিতেছ। আমি তো বালক মাত্র, একটা হিংস্র জন্তু পর্যন্ত সে-হাসির রবে ভয় পাইয়াছিল। হঠাৎ সেই সময় তীরের দিকে চোখ পড়ায় আমি দেখিলাম, তীরের কাছে জঙ্গলের মধ্যে একটা চিতাবাঘ বোধ হয় মাছ ধরিতেছিল, হঠাৎ সেই বিকট হাসির রবে চমকিয়া উঠিয়া সে দৌড় দিল।

যাহা হউক, লোকটা আমাকে বলিল, তোমাদের বজরা এবং লোকজন এতক্ষণ জলের নীচে বিশ্রাম করছে। সেখানে যাওয়ার চেয়ে, বোধ হয় আমাদের সঙ্গে যাওয়া মন্দ নয়। আর কে-ই বা তোমাকে সেখানে দিয়ে আসতে যাবে, কী বল? বুঝিলাম, ডাকাতেরা আমাদের সঙ্গের লোকজনকে হত্যা করিয়া বজরা সমেত সমুদ্র-জলে ডুবাইয়া দিয়াছে।

প্রথম প্রথম আমার মনে খুব ভয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু যখন শুনিলাম যে ডাকাতেরা আমাদের বজরা ডুবাইয়া দিয়াছে, লোকজনদিগকেও হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে এবং যখন দেখিলাম যে, আমি সম্পূর্ণরূপে ইহাদের হাতেই পড়িয়াছি, তখন আমার ভয় একেবারে চলিয়া গেল। বিপদে পড়িবার ভয়েই লোকে ভয় পায়। কিন্তু বিপদের মধ্যে পড়িলে তখন আর সে ভয় থাকে না। আমারও তাহাই হইল। আমি রাগিয়া উঠিয়া বলিলাম, জলে ডুবে মরতে হয় সেও ভালো, তবু আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না; চোর-ডাকাতের সঙ্গে একত্রে থাকার চেয়ে মরাও ভালো। নামিয়ে দাও তোমরা আমাকে এইখানেই।

লোকটি আবার তেমনি বিকট করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং অন্যেরাও তাহার হাসিতে যোগ দিল। বলিল, কোথায় নামবে এখানে? এ যে সুন্দরবন! এখানে জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ, সে-কথা কি জান না? বিশ্বাস না হয়, ওই দেখো–এই বলিয়া সে কূলের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল। আমি চাহিয়া দেখিলাম একটা বাঘ খালের তীরে আসিয়া জলপান করিতেছে। তখন ভাবিলাম, কথা তো মিথ্যা নয়। আমাকে

ডাকাতেরা সুন্দরবনের মধ্যে লইয়া আসিয়াছে, এখানে এই ভয়ংকর স্থানে কোথায় গিয়া আমি দাঁড়াইব? বুঝিলাম ইহাদের সঙ্গে জোর করিয়া লাভ নাই। বাধ্য হইয়াই আমাকে ইহাদের প্রস্তাবে রাজি হইতে হইল, সুতরাং, আমি আর কোনো কথা কহিলাম না। নীরবে সহিয়া নিজের অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলাম। সেই ছিপের উপর বসিয়া বসিয়া বাড়ির কথা, দাদামহাশয়ের কথা, মা-বাবার কথা, ভাই বোনের কথা– সমস্ত একে একে মনে উঠিতে লাগিল। তখন একবার মনে হইয়াছিল, কেন সকলের অবাধ্য হইয়া গঙ্গাসাগরে আসিয়াছিলাম? এই ঘটনার মূলই আমি। আমার জন্যই এতগুলি লোক ডাকাতের হাতে প্রাণ হারাইল। আমার চলাফেরা ভাবগতিক দেখিয়াই তো ডাকাতেরা ঠাহর পাইয়াছিল; আমি না আসিলে তাহারা কোনো সন্ধানই পাইত না। দাদামহাশয় সমস্ত রাত্রি কপিল মুনির মন্দিরে ছিলেন, ভোর বেলা নদীতীরে আসিয়া বজরা দেখিতে না পাইয়া তিনিই বা কী করিতেছেন? ডাকাতেরা সকলকে হত্যা করিল, আমাকে কেন হত্যা করিল না এবং কেনই-বা আমাকে তাহারা লইয়া আসিল? এই সকল নানা চিন্তায় আমি একেবারে ডুবিয়া গেলাম। সেই সময় হঠাৎ একটা বিকট শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। সেই লোকটা বলিল, ওই শুনছ, এখানে নামবে? ওই চেয়ে দেখো! আমি কূলের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, একটা প্রকান্ড বাঘ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, বুঝিলাম সে বিকট রব আর কিছু নয়, এই বাঘেরই ডাক।

সেই গভীর জঙ্গলের মধ্যে সেই খালে অনেক ঘুরিয়া-ফিরিয়া ছিপখানি এক স্থানে গিয়া লাগিল। আমরা সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র, পূর্বদিনের সেই বালকটি কোথা হইতে দৌড়িয়া আসিল এবং চিরপরিচিতের ন্যায় আমাকে আসিয়া বলিল, ভাই এসেছ, এই আমাদের বাড়ি! আমি আশ্চর্য হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন, আমি যে আসব তুমি কি তা জানতে? সে বলিল, বাবা বলেছিল যে আমি যদি তার কথামতো কাজ করি, তবে আমার খেলবার সাথি করবার জন্য তোমাকে এনে দেবে।

সে যাহাই হউক, নৌকায় বসিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম যে ইহারা যেখানে গিয়া নৌকা রাখিবে, আমি সেইখান হইতে চলিয়া যাইব। কিন্তু পরে দেখিলাম এই অচেনা অজানা স্থানে, এই ভয়ংকর সুন্দরবনের মধ্যে ইহারাই আমার একমাত্র আশ্রয়। ইহাদিগের নিকট হইতে পলাইতে চেষ্টা করা বৃথা এবং পলাইয়া যাইবই-বা কোথায়? চারিদিকে হিংস্র জন্তুর ভয়। সেই দিন বিকালেই একটি ঘটনায় আমি প্রাণ হারাইতেছিলাম। বিকালে আমি ও সেই মগ বালকটি বেড়াইতে গিয়াছিলাম। একস্থানে দেখিলাম একরকম বনফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহারই একটি লইবার বড়ো ইচ্ছা হইল এবং আমি ধীরে ধীরে জলের কাছে গেলাম। একটি ফুল ধরিবার জন্য যেমন হাত বাড়াইয়াছি, অমনি সেই মগ বালকটি একটা চিৎকার করিয়া উঠিল। আমি সেই চিৎকারে চমকিত হইয়া পা পিছলাইয়া জলে পড়িয়া গেলাম, জলের স্রোতে খানিকটা দূরে গিয়া ভাসিয়া উঠিলাম, কিন্তু উঠিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার হাত-পা

একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেল। আমার সেই অবস্থা দেখিয়া আমার সঙ্গী দৌড়াইয়া আসিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং হাতে ধরিয়া আমাকে টানিয়া তীরে তুলিল।

আমি যখন ফুলটির প্রত্যাশায় জলের কাছে যাইতেছিলাম, তখন জঙ্গলের ভিতর হইতে একটা প্রকান্ড বাঘ ও একটা প্রকান্ড কুমির একই সময় আমাকে লক্ষ করিতেছিল। বাঘ যখন আমাকে ধরিবার জন্য লাফ দেয়, তখন আমার সঙ্গী বালক তাহা দেখিতে পাইয়া চিৎকার করিয়া উঠে এবং আমি ঠিক সেই সময়েই জলের মধ্যে পড়িয়া যাই। এদিকে ঠিক যে-সময় বাঘ লাফ দেয়, কুমিরও সেই সময় আমাকে ধরিতে আসে। কিন্তু ভগবানের কৃপায় পা পিছলাইয়া জলে পড়িয়া যাওয়াতে আমি উভয়ের হাত হইতে রক্ষা পাই। বাঘটা লম্ফ দিয়া কোথায় আমাকে ধরিবে না কুমিরের মুখের মধ্যে পড়িয়া গেল!

মগ বালকটির সহিত অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমার খুব ভাব হইয়া গেল। কীসে আমি সুখী হইব, কী করিলে সুন্দরবনের সেই জঙ্গলবাসের কষ্ট আমার দূর হইবে, সে কেবল দিনরাত্রি সেই চেষ্টায় থাকিত। তাহার নাম ছিল মউংনু। আমি তাহাকে মনু বলিয়া ডাকিতাম। মনুর মা-ও আমাকে আপনার ছেলের মতো দেখিতেন। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবহীন সেই জঙ্গলে যাহাতে আমি মায়ের অভাব না বুঝিতে পারি, তিনি প্রাণপণে সে চেষ্টা করিতেন।

সেই নিষ্ঠুর দস্যুদলের মধ্যে যে এমন দুইটি স্নেহমাখা কোমল হৃদয় আছে, তাহা আমি আগে বুঝিতে পারি নাই। এবং এমন যে থাকিতে পারে, তাহাও বিশ্বাস করিতে পারি নাই। বাস্তবিকই মনু ও তাহার মায়ের যত্ন, আদর স্নেহ ও ভালোবাসায় আমি কোনো কষ্ট বা অভাবই বোধ করিতাম না। বাড়ির জন্য প্রথম প্রথম যে কষ্ট হইত, তাহাও যেন ক্রমে ভুলিয়া যাইতে লাগিলাম।

মনু ছায়ার মতো সর্বদাই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে; আমরা একত্রে খাই, একত্রে শয়ন করি, একত্রে বেড়াইতে যাই। মনুর বুদ্ধি বেশ তীক্ষ্ণ ছিল এবং সে আমার সমবয়স্ক ছিল। আমার বয়স তখন তেরো বৎসর। ইংরেজিতে আমি যে-সকল বাঘ-ভালুকের গল্প পড়িয়াছিলাম, মনুকে তাহা বলিতাম, তাহা ছাড়া, রামায়ণ-মহাভারতের গল্প তাহাকে শুনাইতাম। খেলা করা, গল্প করা এবং ক্ষুধার সময় খাওয়া ভিন্ন আমাদের আর কোনো কাজ ছিল না। মনুও সন্দুরবনের বাঘ-ভালুকের অনেক গল্প আমাকে শুনাইত। কিন্তু রামায়ণ মহাভারতের গল্প তাহার কাছে সম্পূর্ণ নতুন ছিল। সে খুব আগ্রহের সহিত সেই সকল গল্প শুনিত। ক্রমে তাহার সেই সকল পড়িবার একটা আগ্রহ জন্মিল। আমারও ইচ্ছা হইল, তাহাকে লিখিতে-পড়িতে শিখাই।

মনু একদিন তাহার বাবাকে গিয়া বলিল, আমাকে বই এনে দাও, আমি লেখাপড়া শিখব। মনুর বাবা তাহার কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল এবং বলিল– বাঙালির ছেলেটা দেখছি তোকে একেবারে বাঙালি করে তুলেছে! লেখাপড়া শিখে তুই কি পন্ডিতি রকমে ডাকাতি করবি নাকি? লেখাপড়া শিখলে তুই কি আর মানুষ থাকবি, ওই বাঙালির ছেলেদের মতো ভীরু হয়ে যাবি, জুজু হয়ে থাকবি। কলম বাঙালির ছেলের অস্ত্র, আমাদের অস্ত্র তিরধনুক, তলোয়ার-বন্দুক। বাঙালির অস্ত্র কলমে বাঘ-ভালুকও শিকার করা যায় না, ডাকাতিও চলে না। যে-বিদ্যে তোর কাজে লাগবে তুই তাই শেখ, অন্য বিদ্যে শিখে তোর দরকার নেই। মনু ছাড়িবার পাত্র নয়। সে বলিল, তুমি জান না তাই ও-কথা বলছ, বইয়ে যে-সকল বীর পুরুষদিগের কথা লেখা আছে, যে-সকল যুদ্ধের কথা লেখা আছে, তা শুনেই আমার শরীর গরম হয়ে ওঠে, সেসব যদি নিজে পড়তে পারি, তবে তাতে আমার সাহস আরও বেড়ে যাবে। তোমরা ডাকাতি করো লুঠপাট করো, আমি রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব, আর তাদের হারিয়ে দিয়ে রাজা হব। কথাগুলি বলিবার সময় যেন মনুর শরীর উৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল। চক্ষু দিয়া যেন একটা তেজ বাহির হইতেছিল। মনুর বাবা তাহার কথায় একটু অবাক হইয়া গেল। আর কোনো কথা না বলিয়া তাহাকে বিদায় করিল।

মনু আমার সমবয়স্ক হইলেও তাহার শরীর খুব বলিষ্ঠ ছিল। এত অল্প বয়সে এপ্রকার সাহসী বালক আমি এ পর্যন্ত দেখি নাই। তির চালনা, তলোয়ার খেলা এবং বন্দুকের ব্যবহার সে এই বয়সেই সুন্দর শিখিয়াছে। তাহার সঙ্গে থাকিয়া আমারও সে-সকল কিছু অভ্যাস হইয়াছিল।

সুন্দরবনে অনেক মধুর চাক জন্মে। সেই সকল চাক ভাঙিয়া মধু সংগ্রহ করা কতকগুলি লোকের ব্যবসায় আছে। আমাদেরও একদিন সখ হইল, একটি চাক ভাঙিব। খুঁজিয়া খুঁজিয়া একটি চাকও পাইলাম। কিন্তু কাছে গিয়া দেখি, তাহাতে এত মৌমাছি বসিয়া আছে যে, একবার যদি তাহারা টের পায়, তাহা হইলে আমাদের চাক ভাঙার শখ মিটাইবে। সুতরাং আমাদের চাক ভাঙা হইল না। আমরা দুঃখিত মনে বাড়ি ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময় একটা হরিণ দেখিতে পাইলাম। আমরা যখনইবাড়ির বাহির হইতাম, তখনই তিরধনুক ও বন্দুক লইয়া বাহির হইতাম, কেননা কখন কোন বিপদে পড়ি তাহার ঠিকানা নাই। হরিণটা দেখিয়া মনু বলিল, বেশ হয়েছে, শুধু-হাতে আর বাড়ি ফিরতে হল না। কিন্তু এখান থেকে হরিণটাকে মারবার সুবিধা হবে না, মাঝখানে ওই একটা ঝোঁপ রয়েছে। খুব পা টিপে টিপে আমার পেছনে পেছনে এসো, একটু ঘুরে গেলে বেশ সুবিধা পাওয়া যাবে? মনুর কথামতো আমি তাহার পিছনে চলিলাম। কিন্তু একটু যাইয়াই মনু থমকিয়া দাঁড়াইল। আমি হরিণটার দিকে চাহিতে চাহিতে চলিতেছিলাম, একেবারে মনুর গায়ের উপর গিয়া পড়িলাম।

সে আমার গা টিপিয়া কানে কানে বলিল, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো। এক চুলও নড়ো না কথাও কয়ো না, ওই দেখো। মনু হাত বাড়াইয়া সম্মুখের দিকে দেখাইয়া দিল। চাহিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দেখিলাম, আমাদের সম্মুখে ৮/১০ হাত দূরে একটা মাটির ঢিবির কোলে একটা বাঘ ওই হরিণটাকে লক্ষ করিয়া আড়ি পাতিয়াছে। আমার বাকরোধ হইয়া গিয়াছিল, নতুবা হয়তো চিৎকার করিয়াই উঠিতাম। তাহা হইলে আমাদের যে দশা হইত তাহা তো বুঝিতেই পারিতেছ। মনুর দেখিলাম অসীম সাহস, সে এক হাতে আমাকে এবং আর এক হাতে বন্দুকটি লইয়া স্থির হইয়া একদৃষ্টে বাঘের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। বোধ হইল, তাহার নিঃশ্বাসও পড়িতেছে না। বাঘটা প্রকান্ড, অত বড়ো একটা জানোয়ার চলিতেছে, অথচ একটুও শব্দ হইতেছে না। এও বড়ো আশ্চর্য বোধ হইল। পরে জানিতে পারিলাম যে কীজন্য ইহারা এত নিঃশব্দে চলিতে পারে। বিড়ালের পায়ের পাতার গঠন তোমরা দেখিয়া থাকিবে, ইহাদের পাও ঠিক সেইরকম, ইহাদের আঙুলের মাথায় খুব তীক্ষ্ণ নখ আছে, আবশ্যক মতো এই নখ বাহির হয় এবং অন্য সময়ে ইহা কচ্ছপের শুড়ের ন্যায় ভিতরে ঢুকিয়া থাকে, তখন পায়ের পাতাটি বেশ গদির মতো হয়। সুতরাং হাঁটিবার সময় কিছুমাত্র শব্দ হয় না। সে যাহাই হউক, বাঘ আড়ি পাতিয়া এক লাফে গিয়া হরিণটার উপর পড়িল এবং তাহার সম্মুখের পায়ের এক আঘাতেই হরিণটার ঘাড় ভাঙিয়া ফেলিল, তারপর তাহাকে লইয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমরাও প্রাণ লইয়া সে যাত্রায় বাড়ি ফিরিলাম।

আর একদিন একটা বাঘ ভারি জব্দ হইয়াছিল। তাহার যে-দুর্দশা হইয়াছিল, বলি শুনো। বাঘ সুন্দরবনের বলিলেই হয়, কিন্তু সুন্দরবনের মহিষগুলিও বড়ো ভয়ংকর, অত বড়ো ও বলবান মহিষ অন্য কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। বাঘে-মহিষে সুন্দরবনে প্রায়ই লড়াই হয়। কখনো বাঘের জিত হয়, কখনো-বা মহিষকে জিতিতে দেখা গিয়া থাকে। সে যাহাই হউক, একদিন একটা মহিষের বাচ্চা চরিতে চরিতে বাথান হইতে একটু দূরে গিয়া পড়িয়াছিল। একটা বাঘ বেচারাকে দেখিয়া লোভ সামলাতে না পারিয়া, যেমন তাহাকে ধরিবার জন্য লাফ দিতে যাইবে, এমন সময় বাচ্চাটি তাহা দেখিতে পাইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। সেই শব্দে একেবারে ছয়-সাতটা মহিষ সেইদিকে দৌড়িয়া আসিল। বাঘ তখন আর পালাইবার অবসরটুকুও পাইল না। সেই ছয়-সাতটা মহিষে মিলিয়া শিং এবং পায়ের আঘাতে বাঘটাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া মারিয়া ফেলিল।

কয়েকদিন ধরিয়া একটা বাঘ আমাদের বাড়ির কাছে ভারি দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে। রাত্রিতে তাহার ভয়ে আমাদিগকে শশব্যস্ত থাকিতে হয়। কখনো ঘরের আনাচে-কানাচে কোনো ছোটো জন্তুর উপর লাফাইয়া পড়িতেছে, কখনো উঠানের উপর দাঁড়াইয়া ডাক ছাড়িতেছে। সকালে উঠিয়া প্রতিদিনই দেখিতে পাই–এখানে একটা

হরিণের মাথা, ওখানে দুটো শুয়োরের দাঁত, কোথাও-বা খানিকটা মহিষের পা। দিনকতক বড়োই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। বাঘটাকে মারিবার জন্য খুব চেষ্টা হইতে লাগিল। তিরধনুক ও বন্দুক লইয়া সকলে ফিরিতে লাগিলাম, কিন্তু সে এত সতর্কভাবে চলাফেরা করিত যে, কোনোমতেই তাহাকে মারিতে পারা গেল না। একদিন এক ঝোঁপের কাছ দিয়া আমরা যাইতেছি, এমন সময় ঝোঁপের আড়ালে পায়ের শব্দ পাইয়া মনে করিলাম, বোধ হয় বাঘ যাইতেছে। বন্দুক ভরাই ছিল। ঠিক করিয়া হাতে লইয়া ঝোঁপের ভেতর দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতে গেলাম; কিন্তু দেখিলাম–বাঘ নয়, একটা গন্ডার। যথা লাভ, আর গন্ডারও বড়ড়া সাধারণ শিকার নয়– গন্ডার গন্ডারই সই। মনু বলিল, খুব আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে এসো, একটু ঘুরে গিয়ে গুলি করতে হবে। আমি দেখিলাম, সেই ঝোঁপের আড়াল থেকে গুলি করাই সুবিধা। আমরা গন্ডারটিকে বেশ দেখিতে পাইতেছি; অথচ সে আমাদিগকে দেখিতে পাইতেছে না। কোনো বিপদের আশঙ্কা নাই, নির্বিঘ্নে গুলি করা যাইবে। মনুকে সে-কথা বলায় সে বলিল, সে কী। তুমি কি জান না যে গন্ডারের চামড়া এত পুরু যে তাতে গুলি বসে না? এখান থেকে ওর শরীরের একটা পাশ দেখা যাচ্ছে, গুলি করলে সে গুলি ওর গায়ে বসবে না, অথচ বন্দুকের আওয়াজে শিকার পালাবে। গন্ডারকে মারতে হলে ওর নাকের ভেতর দিয়ে গুলি করতে হবে। কাজেই ঘুরে সমুখদিকে না গেলে ওকে মারতে পারা যাবে না। এই বলিয়া মনু আগে আগে চলিল। আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে গেলাম এবং এমন একটি জায়গায় গিয়া দাঁড়াইলাম, যেখান থেকে গন্ডারের নাকটি বেশ লক্ষ হয়। তখন মনু আমাকে গুলি করিতে বলিল। অত বড়ো একটা জানোয়ার শিকার করিয়া একটু যশলাভ করিবার আশা আমার না হইয়াছিল তা নয়, কিন্তু আমার হাত তখনও খুব সই হয় নাই। বিশেষত অত বড়ো শরীরটার সমস্তই বাদ দিয়া কোথায় নাকের একটা ক্ষুদ্র ছিদ্র, সেইখানে গুলি করিতে হইবে, কাজেই আমি রাজি হইলাম না। তখন মনু বলিল, তবে বন্দুকটা ঠিক করে দাঁড়াও, যদি গুলি নাকে না লাগে আর আমাদের দিকে রোখ করে আসে, তবে আর রক্ষে থাকবে না। এই বলিয়া সে বন্দুক সই করিল। গন্ডারটা চোখ বুজিয়াছিল, আমাদিগকে দেখিতে পায় নাই। আমরা মনে করিলাম, ভারি সুবিধাই হইয়াছে। গন্ডারটা আমাদের দেখিতে পায় নাই বটে, কিন্তু তাহার শরীরের উপর গোটাকতক পাখি বসিয়াছিল, তাহারা আমাদিগকে দেখিয়া ভারি ডাকাডাকি আরম্ভ করিল। শেষে ডাকাডাকি ছাড়িয়া গন্ডারটার চোখে-মুখে পাখার ঝাঁপটা মারিতে লাগিল। ঝাঁপটা খাইয়া গন্ডারটা তখন চোখ খুলিল। চোখ খুলিয়াই আমাদিগকে দেখিয়া ভোঁ-দৌড়। মনু যদিও ঠিক সেই সময়েই বন্দুকের ঘোড়া টানিয়াছিল, কিন্তু সে-পর্যন্ত পৌঁছিতে-না পৌঁছিতে গন্ডারটা সরিয়া যাওয়ায়, গুলিও লাগিল না, শিকারও পলাইল। বেলা তখন অনেক হইয়াছে, কাজেই সেদিনকার মতো আমাদের বাড়ি ফিরিতে হইল।

বাড়ি ফিরিয়া গেলে মনুর বাবা জিজ্ঞাসা করিল, কী, আজ কী শিকার করলে? আমরা সকল ঘটনা তাহাকে বলিলাম এবং এমন শিকারটা পাখিগুলোর জ্বালায় হাতছাড়া হইল বলিয়া দুঃখপ্রকাশ করিলাম। মনুর বাবা সেই কথা শুনিয়া, আমার প্রায়ই হয়। কেবল গন্ডার কেন, পাখির জ্বালায় অনেক শিকারই ওইরকম করে হাতছাড়া হয়। গন্ডারের গায়ে একরকম খুব ছোটো ছোটো কীট আছে তারা গন্ডারকে বড়ো যাতনা দেয়। পাখিরা সেই কীট ঠোঁট দিয়ে খুঁটেখুটে খায়, এতে গন্ডারেরও উপকার হয়, তাদেরও পেট ভরে। শুধু শরীরের নয়, নাকের মধ্যে, চোখের কোণে, কানের বা মুখের ভেতর থেকেও এরা ওই কীট খুঁটে খুঁটে বার করে। চোখ বা কান প্রভৃতি নরম জায়গা থেকে কীট বার করবার সময় গন্ডারদের সময় সময় বেশ একটু যাতনা পেতে হয়। কিন্তু কীটের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তারা সে কষ্ট সহ্য করে থাকে। এইপাখিরা যে কেবল কীটের হাত থেকেই গন্ডারকে রক্ষা করে তা নয়, মানুষের হাত থেকেও এদের রক্ষা করে। যখনই গন্ডারের কোনো বিপদ দেখে, তখনই এরা খুব চিৎকার আরম্ভ করে এবং তাতেই গন্ডারের হুশ হয়–গন্ডার তখন বিপদ বুঝতে পেরে পালায়।

গোরু-মহিষ প্রভৃতির গায়ে ও মাথায় বসে একরকম পাখিকে তোমরা ঠোকরাতে দেখে থাকবে। তাদেরও ওই কাজ। গোরু বা মহিষের গায়েও একরকম কীট আছে, তারা এদের বড়ো কষ্ট দেয়, পাখিরা ওই সকল কীট ঠুকরে খায় এবং কোনো বিপদের আশঙ্কা দেখলে তারা ওইরকম করে গোরু, মহিষ প্রভৃতিকে সতর্ক করে দেয়।

এ তো গেল গোরু, মহিষ, গন্ডার প্রভৃতির কথা। পাখিদের ঠোকরানিতে ওরা ব্যথা পেলেও তাদের কিছু বলে না। আর কিছু করবার ক্ষমতাও তাদের বড়ো একটা নেই। পিঠের ওপর বেশ ঠোকরাচ্ছে, ব্যথা পেলে বড়ো জোর একবার শিং নাড়া দেবে, আর তখনি পাখিরা উড়ে সরে যায়, শিং নাড়াই সার। যেখানে বিপদের বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে, সেখানেও পাখিদের খুব যেতে দেখা যায়। একবার আমি দেখলাম জলার ধারে একটা প্রকান্ড কুমির চোখ বুজে হাঁ করে বেশ স্থিরভাবে পড়ে আছে। আমি মনে করলাম, বেশ সুবিধাই হয়েছে– হাঁ করে আছে, ঠিক মুখের ভেতর গুলিটি চালিয়ে দিলেই কাজ হবে। এই ভেবে যেমন বন্দুক তুলেছি অমনি কতকগুলি পাখি ভারি ডাকাডাকি আরম্ভ করল। কুমিরটা সেই ডাকে চোখ খুলেই মুহূর্তের মধ্যে জলে লাফিয়ে পড়লে। আমার আর গুলি করা হল না। কুমিরের দাঁতের ভেতর একরকম কীট জন্মায়, সেই কীটের জ্বালায় দাঁতের গোড়া ফুলে কুমিরকে এক সময় ভারি কষ্ট পেতে হয়। তাই প্রায়ই সন্ধ্যার আগে দেখতে পাওয়া যায় যে, জলের ধারে কুমির হাঁ করে পড়ে আছে আর এক জাতীয় পাখি নিঃসংকোচে নির্ভয়ে তার সেই মুখের ভেতর গিয়ে দাঁতের ভেতর থেকে পোকাগুলো খুঁটেখুঁটে বার করছে। এমন ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যাচ্ছে। কুমির, হাঁ করেই আছে, পাখিরাও ঘুরে-ফিরে পোকা খুঁজে বেড়াচ্ছে। কুমির বিলক্ষণ হিংস্র জন্তু, যখন হাঁ করে থাকে, তখন এক-একবারে চার-পাঁচটারও

www.bengaliebook.com

বেশি পাখি তাদের মুখের মধ্যে যায়। ইচ্ছা করলে একবার মুখ বন্ধ করলেই পাখিগুলি উদরসাৎ হয়। কিন্তু যারা তাদের এত উপকার করে দাঁতের পোকা ভালো করে, তাদের সঙ্গে তারা এমন অধর্ম করে না। তবে কখনো কখনো এমন হয় যে, খুব বেশিক্ষণ হাঁ করে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে হয়তো হঠাৎ মুখ বন্ধ করে বসে। তখন যদি কোনো পাখি বেরোতে না পেরে মুখের ভেতর থেকে যায়, তবে সে এমন জোরে ঠোঁট দিয়ে মুখের ভেতরে আঘাত করতে থাকে যে, কুমিরকে বাপের সুপুত্তুর হয়ে তখনই আবার হাঁ করতে হয়।

সে যাহা হউক, কথায় কথায় আমরা আসল কথাই ভুলিয়া গিয়াছি, বাঘটা তো এ পর্যন্ত কোনো মতেই মারা পড়িল না। কিন্তু একদিন ভারি মজা হইল। সকাল বেলা বাঘের ভয়ানক ডাকে আমাদের ঘুম ভাঙিয়া গেল, আমি তো চমকিয়া উঠিলাম। উঠিয়া শুনিলাম, মনুর বাবা বলিতেছে, আপদ চুকেছে, বাঘ ফাঁদে পড়েছে। তখনআর বিলম্ব না করিয়া তিরধনুক, বন্দুক ও লাঠি প্রভৃতি লইয়া সকলেই বাহির হইয়া পড়িল। আমরাও সঙ্গে গেলাম। বাঘটাকে মারিবার জন্য যেমন সকলে বন্দুক ও তিরধনুক লইয়া বেড়াইত, তেমনি এক জায়গায় জাল দিয়া একটা ফাঁদও পাতিয়া রাখা হইয়াছিল। অনেক সময় এই সকল ফাঁদে বাঘ ধরা পড়ে।

আমরা গিয়া দেখিলাম, আমাদের সেই জালে বাঘটা ধরা পড়িয়া ভয়ানক তর্জন-গর্জন করিতেছে এবং জাল ছিঁড়িয়া বাহির হইবার জন্য ভারি লম্ফঝম্ফ করিতেছে। কিন্তু বড়ো বেশিক্ষণ লম্ফঝম্প করিতে হইল না। জালের মধ্যে অধিকক্ষণ রাখাটা নিরাপদ নয় বলিয়া তখনই গুলি করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলা হইল।

কিছুকাল পরে মনু একদিন আমায় চুপি চুপি বলিল– চলো, আজ শিকারে যাওয়া যাক–

বলিলাম– কোথায়?

সে বলিল– সেখের ট্যাঁকে।

সে আবার কোথায়?

চলো দেখাব।

একদিন দুপুরের আগে আহারাদি সারিয়া দু-জনেই রওনা হইলাম। উহাদের বাড়িতে ভাত খাইতে আমার প্রথম প্রথম বড়োই অসুবিধা হইত। মনুকে বলি–কী রে এটা?

ও বলে–শুঁটকি মাছ।

www.bengaliebook.com

পারব না খেতে। কখনো না।

কেন?

অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসবে যে রে!

দু-পাঁচ দিন খেতে খেতে ভালো লাগবে দেখো।

হ্যাঁ, তা আবার কখনো লাগে?

আচ্ছা দেখে নিও।

সেই থেকে মাস দুই কাটে। শুঁটকি মাছে আর দুর্গন্ধ পাই না। মন্দ লাগে না ও জিনিসটা আজকাল। মনুর কথাই ঠিক।

মনুদের বাড়ির নীচে ছোট্ট একটা খাল। এই খালের ধারে ছিল একটা ডিঙি বাঁধা। দু-জনে ডিঙিতে গিয়া তো উঠিলাম। খানিক পরে আর একজন ছেলে আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, উহার নাম নিবারণ মাঝি। মনুদের নৌকা চালায় যে মাঝি তাহারই ছেলে। সে খুব ভালো নৌকা চালায় বলিয়াই তাহাকে লওয়া হইল।

একটা জিনিস দেখিলাম। নিবারণ একটা থলিতে অনেক চিড়ামুড়ি আনিয়াছে। এত চিড়ামুড়ি আনার কারণ কী তখন বোঝা যায় নাই বটে, কিন্তু বেশি দেরিও হয় নাই বুঝিতে।

খালের পাশে কেওড়া ও গোলপাতা বনের গায়ে ছলাৎ ছলাৎ করিয়া জোয়ারের জল লাগিতেছে। রোদ পড়িয়া চকচক করিতেছে নদীজল। ঘন নিবিড় অরণ্যের বন্যবৃক্ষের গুঁড়িতে গুঁড়িতে জলের কম্পমান স্রোতধারার ছায়া।

আমার মনে চমৎকার একটা আনন্দ। মুক্তির একটা আনন্দ–যাহার ঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারিব না। দাদামশায়ের সঙ্গে সুন্দরবনে না আসিলে এ আনন্দ পাইতাম কি? ছিলাম ক্ষুদ্র গৃহকোণে আবদ্ধ তেরো বছরের বালক। বিশাল পৃথিবীর বুকে যে কত আনন্দ, কী যে তাহার মুক্তিরূপা মহিমা, আমার কাছে ছিল অজানা। নিবারণ অনেক দূরে লইয়া আসিয়াছে, বনের প্রকৃতি এখানে একটু অন্যরকম। বনের দিকে চাহিয়া দেখি একটা গাছে অনেক বাতাবি লেবু ফলিয়া আছে–ডাঙার খুব কাছে।

www.bengaliebook.com

বলিলাম–নিবারণ, নিবারণ, থামাও না ভাই। ওই দেখো—

নিবারণ ডিঙি ভালো করিয়া না থামাইয়াই ডাঙার দিকে চাহিয়া বলিল–কী?

ওই দেখো। পাকা বাতাবি লেবু!

না বাবু।

ওই যে, দেখো না! মনু, চেয়ে দেখো ভাই—

নিবারণ হাসিয়া বলিল–একটা খেয়ে দেখবে বাবু?

কেন?

ওকে বলে পশুর ফল। পাখিতে খায়। মানুষের খাবার লোভে গাছে থাকত?

মনুও হাসিয়া নিবারণের কথায় সায় দিল।

খালের মুখ গিয়া একটা বড়ো নদীতে পড়িল–তাহার অপর পাড় দেখা যায় না। এইবার আমাদের ডিঙি সামনের এই বড়ো নদীতে পড়িবে। নদীর চেহারা দেখিয়া আমার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। এত ঢেউ কেন এ নদীতে?

বলিলাম–এ কী নদী ভাই?

নিবারণ এ অঞ্চলের অনেক খবর রাখে। সে বলিল–পশোর নদী। খুলনা জেলার বিখ্যাত নদী। হাঙর-কুমিরে ভরা। শিবসা আর পশোর যেখানে মিশেছে, সে-জায়গা দেখলে তো তোমার দাঁত লেগে যাবে ভাই।

খুব বড়ো?

সাগরের মতো। চলো সেখানে একটা জিনিস আছে, একদিন নিয়ে যাব।

কী জিনিস?

এখন বলব না। আগে সেখানে নিয়ে যাব একদিন। এইবার পশশার নদীতে আমাদের ডিঙি পড়িয়া কূল হইতে ক্রমশ দূরে চলিল। খানিকটা গিয়া হঠাৎ নিবারণ দাঁড় ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বহুদূর ওপারের দিকে চাহিয়া বলিল–কী ওটা?

মনু বলিল–কই কী?

ওই দেখো। একটু একটু দেখা যাচ্ছে।

ভালো দেখা গেল না কি?

কী জিনিস ওটা?

আমিও ততক্ষণে ডিঙির ওপর দাঁড়াইয়া উঠিয়াছি। ভালো করিয়া চাহিলাম বটে, কিন্তু কিছু দেখা গেল না। নিবারণ নদীতে পাড়ি দিতে দিতে প্রায় মাঝখানে আসিল। এবার বেশ দেখা যাইতেছিল ব্যাপারটা কী। এক পাল হরিণ কেওড়াবনে জলের ধারে চরিতেছে। একটা হরিণ কেওড়া গাছের গুঁড়ির গায়ে সামনের দুই পা দিয়া উঁচু হইয়া গাছের ডালের কচিপাতা চর্বণ করিতেছে। কী সুন্দর ছবিটা! নিবারণ মনুকে বলিল–ভাই, আজ যাত্রা ভালো। ওই হরিণের পালের মধ্যে একটা মারা পড়বে না? এক-একটাতে এক মণ মাংস। দু-মণ মাংসওয়ালা হরিণও ওর মধ্যে আছে।

মনু বলিল–চলো।

নিবারণ বলিল–শক্ত করে হাল ধরতে যদি না সাহস করো, তবে তুমি দাঁড় নাও। এর নাম পশশার নদী। খুব সাবধান এখানে।

আমি সভয়ে বলিলাম– দে মনু, ওর হাতে হাল।

মনু নির্ভয় কণ্ঠে বলিল–মগের ছেলে অত ভয় করে না। হাল ধরতে পারব না তো কী? খুব পারব। টানো দাঁড়।

অত বড়ো নদীতে পাড়ি দিতে অনেকক্ষণ লাগিল। আমরা যেখানে নামিলাম, সে জায়গাটা একবারে জনহীন অরণ্য, একটু দূরে একটা ছোটো খাল জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়াছে, তীরে গোলপাতা ও বেতের ঝোঁপ।

কোথায় হরিণ। সব সরিয়া পড়িয়াছে।

মনু ছাড়িবার পাত্র নয়। সে নৌকা থামাইয়া আমাদের সঙ্গে করিয়া ডাঙায় নামিল। বলিল –চলো, জঙ্গলের মধ্যে এগিয়ে দেখি–

নিবারণ হরিণের পায়ের দাগ অনুসরণ করিয়া অনেকদূর লইয়া চলিল আমাদের। এক জায়গায় কী একটা সরু দুচোলো জিনিস আমার পায়ে ঢুকিয়া যাইতেই আমি বসিয়া পড়িলাম। ভয় হইল সাপে কামড়ায় নাই তো?

নিবারণ ছুটিয়া আসিয়া আমাকে তুলিয়া দাঁড় করাইল। বলিল– এঃ রক্ত পড়ছে যে? শুলো ফুটেছে দেখছি–সাবধানে যেতে হয় জঙ্গলের মধ্যে

শূলো কী?

গাছের শেকড় উঁচু হয়ে থাকে কাদার ওপরে। তাকে শূলো বলে।

মনু বলিল–আমার বলতে ভুল হয়ে গিয়েছিল। শুলোর জন্যে একটু সাবধানে হেঁটো জঙ্গলে।

জঙ্গলের শোভা সে-স্থানটিকে মনোহর করিয়াছে। কেওড়া ও গরান গাছের মাথায় একরকম কী লতার বেগুনি ফুল। বড়ো গাছে এক প্রকারের সাদা ফুল জোয়ারের জলে নামিয়া শূলোর দল কাদার উপর মাথা তুলিয়া সারবন্দি বর্শার ফলার মতো খাড়া হইয়া আছে। কুস্বরে কী একটা পাখি ডাকিতেছে গাছের মগডালে।

নিবারণ থমকাইয়া দাঁড়াইয়া বলিল–দাঁড়াও না? মাছজটা ডাকছে, নিকটে বাঘ আছে। কোথাও, ওরা হরিণদের জানিয়ে দেয় ডাক দিয়ে। ভারি চালাক পাখি।

মনু বলিল–বাঘ নয়। মানুষ-বাঘা, মানে আমরা।

–তাও হতে পারে। এ ত্রিসীমানায় হরিণ থাকবে না আর।

আমি বিস্ময়ের সুরে বলিলাম–সত্যি?

নিবারণ বলিল–দেখো। ও আমার কতবার পরখ করা। এসববনে নানা অদ্ভুত জিনিস আছে। একরকম গুবরে পোকা আছে, তাদের গা অন্ধকারে জ্বলে। হাঙুরে শিঙি মাছ আছে, কাঁটা হেনে তোমার সমস্ত শরীর অবশ করে দেবে।

নিবারণের কথাই ঠিক। আমরা খালের পাড় পর্যন্ত খোঁজ করিয়াও হরিণের দলের কোনো সন্ধানই পাইলাম না। এক জায়গায় কাদার উপর মোটা কাঠের গুঁড়ি টানিয়া লইয়া যাইবার দাগ দেখিতে পাইয়া নিবারণ মনু একসঙ্গেই ভয়ের সুরে বলিয়া উঠিল–ওরে বাবা!–এ কী?

www.bengaliebook.com

চাহিয়া দেখিয়া কিছু বুঝিতে না পরিয়া বলিলাম–কী এটা?

নিবারণ বলিল–বড়ো অজগর সাপ এখান দিয়ে চলে গিয়েছে, এটা তারই দাগ। একটু সাবধানে থাকবে সবাই–অজগর বড়ো ভয়ানক জিনিস। একবার ধরলে ওর হাত থেকে আর নিস্তার নেই। বলিতে বলিতে একটা কেওড়া গাছের দিকে উত্তেজিতভাবে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিতে লাগিল–ওই দেখোচট করে এসো–

দেখি, এক বিরাটকায় সর্প কেওড়া গাছের ডালে ল্যাজ জড়াইয়া নিশ্চলভাবে খালের জলের হাতচারেক উপরে ঝুলিয়া আছে। সর্পের গায়ের রং গাছের ডালের রঙের সঙ্গে মিশিয়া এমন হইয়া গিয়াছে যে সর্পদেহকে মোটা ডাল বলিয়া ভ্রম হওয়া খুবই স্বাভাবিক। নিশ্চল হইয়া থাকার দরুন এ ভ্রম না হইয়া উপায় নাই।

আমি কী বলিতে যাইতেছিলাম, নিবারণ বলিল–আস্তে, একদম চুপ–

কী?

দেখো না—চুপ–

আমরা গাছের গুঁড়ির আড়ালে নিস্পন্দ অবস্থায় দাঁড়াইয়া। নিবারণ আমাদের আগের দিকে। কী হয় কী হয় অবস্থা! মনু হয়তো কিছু বোঝে, আমি নতুন লোক কিছুই বুঝি না ব্যাপার কী। ঘণ্টাখানেক এইভাবে কাটিল। আমি বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। কতক্ষণ এভাবে থাকা যায়। কেনই-বা এখানে খাড়া হইয়া আছি কাঠের পুতুলের মতো? সর্পদেহও আমাদের মতো নিশ্চল। গাছের ডাল নড়ে তো সাপ নড়ে না। এমনসময়ে এক আশ্চর্য কান্ড ঘটিল। আজও সে-ছবি আমার চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে।

একটা বড়ো শিঙেল হরিণ বেতঝোঁপের পিছন থেকে সন্তর্পণে খালের দিকে আসিতে লাগিল। বেতঝোঁপের ডান দিকে একটা ছোটো হেঁতাল গাছ; তারপরই বড়ো গাছটা, যাহার ডালে সর্প ঝুলিতেছে। হরিণটা একবার আসে, শুকনো পাতার মচমচশব্দ হয়, আবার খানিকটা দাঁড়ায়, আবার কী শোনে, আর একটু আসে, সর্পের ধ্যানমগ্ন অবস্থা– সে কি হরিণটা দেখিতে পায় নাই? নড়ে না তো? হরিণটা এইবার আসিয়া খালের কাদা পার হইয়া জলে নামিয়া চকিতে একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া জলে মুখ দিল। জল খানিকটা পানও করিল। যেখানে হরিণ জলপানরত, সর্পের দূরত্ব সেস্থান হইতে দু-হাতের বেশি। হঠাৎ সর্পের ধ্যান ভাঙিয়া গেল। বিদ্যুতের চেয়েও বেশি বেগে সেই বিশালদেহ অজগর দেহ লম্বা করিয়া দিয়া হরিণের ঘাড় কামড়াইয়া ধরিতেই হরিণ আর্তস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল। তারপর সব চুপ। সাপটা ডাল হইতে নিজের দেহ ছাড়াইয়া ক্রমে ক্রমে হরিণের সমস্ত দেহ জড়াইয়া প্যাঁচের উপর প্যাঁচ দিতে লাগিল।

www.bengaliebook.com

খানিকটা পরে হরিণের শিং আর পা দুটো ছাড়া আর কিছুই দেখা যাইতেছিল না। গলাটা বোধ হয় প্রথমেই চাপিয়াছিল।

মনু ইশারা করিয়া জানাইল সে তির ছুড়িবে কিনা।

নিবারণ ইঙ্গিতে বারণ করিল।

সাপ তখন হরিণের দেহটাকে পায়ের দিক হইতে গিলিতে শুরু করিয়াছে। অজস্র লালারস সর্পের মুখবিবর হইতে নিঃসৃত হইয়া হরিণের সর্বদেহ সিক্ত হইতেছে, স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। যখন পা দু-খানা সম্পূর্ণ গেলা হইয়া গিয়াছে, তখন নিবারণ প্রথম কথা কহিয়া বলিল–ব্যাস! এইবার সবাই কথা বলো–

আমি বলিলাম–বলব?

কোনো ভয় নেই, বলো।

চোখের সামনে এই ভীষণ দৃশ্য ঘটিতেছে, বিস্ময়ে ও ভয়ে কেমন হইয়া গিয়াছি দু জনেই। অত সাহসী মগ বালক মনুর মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, চোখে অদ্ভুত বিস্ময়ের দৃষ্টি। সে প্রথম কথা বলিল–পালাই চলো।

নিবারণ বলিল–পালানোর দরকার ছিল বরং আগে। এখন আর কী।

আমি বলিলাম– কেন?

ও সাপ যদি আগে আমাদের টের পেত তবে ডালের প্যাঁচ খুলে আমাদের আক্রমণ করবার চেষ্টা করত–এখন ওর নড়নচড়ন বন্ধ, শিকার গিলছে যে।

তাহলে আমরা ওকে শেষ করে দিই?

মনু ও নিবারণ দুইজনে হাসিয়া উঠিল। নিবারণ বলিল–অত সোজা নয়।

বলিলাম– কেন, তির ছুঁড়ে?

ছুঁড়ে দেখতে পার। কিছুই হবে না। দু-একটা তিরের কর্ম নয় অজগর শিকার।

তবে?

ওর অন্য উপায় আছে। এখন শুধু দেখে যাও।

দেখব আর কী সে বীভৎস দৃশ্য! অত বড়ো শিঙেল হরিণের প্রায় সমস্তটা অজগর গিলিয়া ফেলিয়াছে, কেবল মুখ আর শিং দুইটা বাদে। কিছুক্ষণ পরে মনে হইল একটা বিশালকায় শিংওয়ালা অজগর জলের ধারে হেঁতাল গাছের নীচে শুইয়া আছে। চার ঘণ্টা লাগিল সমস্ত ব্যাপারটা ঘটিতে। আমরা আসিয়া আমাদের ডিঙিতে চড়িলাম। বেলা বেশি নাই। নিবারণ ডিঙি ছাড়িল। পরে নদীতে জোয়ার আসিতেছে। একটু একটু বাতাস উঠিতেছে দেখিয়া মনু বলিল–সাবধান–সাবধান–

নিবারণ বলিল– জোর করে হাল ধরো।

আমি বলিলাম– কেন, কী হয়েছে?

কিছু না। সাবধান থেকো।

কীসের ভয়?

পরে সেকথা হবে।

বেশি দূর যাইতে-না-যাইতেই নিবারণের কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। জোয়ার বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মাঝনদীতে জোরে হাওয়া উঠিল। এক-একটা ঢেউয়ের আকার দেখিয়া আমার মুখ শুকাইয়া গেল, বুকের মধ্যে কেমন করিতে লাগিল। সে কী ঢেউ! ঢেউ যে অত বড়ো হয়, তাহা কী করিয়া জানিব? সমুদ্রে বড়ো ঢেউ হয় শুনিয়াছি কিন্তু এ তো নদী, এখানে এমন ঢেউ? আমাদের ডিঙি দুই পাশের পর্বত-প্রমাণ ঢেউয়ের খোলের মধ্যে একবার একবার পড়িতে লাগিল, আবার খানিকক্ষণ বেশ যায়, আবার ঢেউয়ের পাহাড় উত্তাল হইয়া উঠে।

মনুর দেখিলাম ভয় হইয়াছে। বলিল–নিবারণ!

কী?

তুমি হালে এসো—

এখন দাঁড় ছেড়ে দিলে ডিঙি বানচাল হয়ে যাবে।

তুমি এসো, আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে!

ঠিক থাকো। বাঁয়ে চাপো।

কতটা আছে?

কী জানি, ডাঙা দেখা যায় না। তুমি বসে থেকো না, দাঁড়িয়ে উঠে হাল ধরো। বসে হাল ধরলে জোর পাবে না।

আমার এসময় হঠাৎ একরকম মরিয়ার সাহস জোগাইল। যদি ওরা বিপন্ন হয়, তবে আমার কি উচিত নয় এদের সাহায্য করা?

বলিলাম–নিবারণ, ও নিবারণ!

সে বিরক্ত হইয়া বলিল–কী?

আমি তোমার হয়ে বাইব?

যেখানে বসে আছ বসে থাকো। মরবে?

তোমাদের সাহায্য করব।

আবার বকবক বকে? দেখছ না নৌকোর অবস্থা?

দেখেই তো বলছি।

কোনো কথা বলবে না।

এবার বিশালকায় পশোর উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে। এমন দৃশ্য কখনো দেখিনি। ডিঙির ডাইনে বাঁয়ে আর কিছু দেখা যায় না, শুধু পাহাড়ের মতো ঢেউ, জলের পাহাড়। সেই পাহাড়ের জলময় অধিত্যকায় আমাদের ডিঙিখানা মোচার খোলার মতো দুলিতেছে, নাচিতেছে, উঠিতেছে, পড়িতেছে, নাকানি-চুবানি খাইতেছে।

একবার বোঁ করিয়া ডিঙিখানা ঘুরিয়া গেল।

নিবারণ চিৎকার করিয়া উঠিল–সামাল! সামাল!

ডিঙি একধারে কাত হইয়া ছপাৎ করিয়া বড়ো এক ঝলক জল উঠিয়া পড়িল ডিঙির খোলে। নিবারণ আমাকে হাঁকিয়া বলিল–ডান দিকে চেপে–

কী করিতেছি না বুঝিয়া ডান দিকে চাপ দিতেই ডিঙি সেদিকে ভীষণ কাত হইয়া গেল। বোধ হয় ডিঙি উপুড় হইয়া পড়িত, নিবারণ দাঁড় দিয়া এক হ্যাঁচকা টান দিতে ডিঙি খানিকটা সোজা হইল।

নিবারণ বলিল–জল হেঁচতে হবে বাবু, পারবে?

বলিলাম–নিশ্চয়ই।

কিন্তু খুব সাবধানে। একটু টলে গেলেই নদীতে ডুবে মরবে।

ঠিক আছে।

সেঁউতি খুঁজে বার করো সাবধানে। খোলের মধ্যে আছে। মনু ভাই, সামলে–বাঁয়ে কসো। আমি সেঁউতি খুঁজিতে উপুড় হইয়া খোলের মধ্যে মুখ দিতে গিয়াছি, এমন সময় পিছন হইতে কে যেন আমায় এক প্রবল ধাক্কা দিয়া একেবারে খোলের মধ্যে আমাকে চাপিয়া ধরিল। আর একটু হইলে মাথাটা নৌকার নীচের বাড়ে লাগিয়া ভাঙিয়া যাইত। সঙ্গেসঙ্গে আমি ডিঙির উপরের পাটাতনের বাড় ডান হাতে সজোরে চাপিয়া না ধরিলে দ্বিতীয় ধাক্কার বেগ সামলাইতে-না-সামলাইতে তৃতীয় ধাক্কার প্রবল ঝাঁপটায় একেবারে জলসই হইতাম।

মনু আর্তস্বরে বলিয়া উঠিল– গেল! গেল!

এইটুকু শুনিতে না শুনিতে আবার প্রবল এক ধাক্কায় আমাকে যেন আড়কোলা করিয়া তুলিয়া উপরের পাটাতনে চিত করিয়া শুয়াইয়া দিয়া গেল। কী করিয়া এমন সম্ভব হইল বুঝিলাম না। আমার তখন প্রায় অজ্ঞান অবস্থা। চক্ষে অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। শুধু নিবারণের কী একটা চিৎকার আমার কানে গেল অতি অল্পক্ষণের জন্যে।

তারপর বাঁ-হাতের উপরের দিকে একটা যন্ত্রণা অনুভব করিলাম। দম যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছে। তখন দেখি নিবারণ ও মনু আমার পাশে আসিয়া হাজির হইয়াছে দাঁড় ও হাল ছাড়িয়া। এ উত্তাল নদীগর্ভে এ কাজ যে কতদূর বিপজ্জনক, এটুকু বুঝিবার শক্তি তখনও আমার ছিল। আমি বলিলাম–ঠিক আছি, তোমরা যাও, ডিঙি সামলাও–

ভগবানের আশীর্বাদে আমার বিপদ সে-যাত্রা কাটিয়া গেল। একটু পরে আমি উঠিয়া বসিলাম। তখনও আমাদের ডিঙি অকূল জলে, সেইরকম পর্বতপ্রমাণ ঢেউ চারদিকে, জল ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। নিবারণ আমাকে হাঁক দিয়া আবার বলিল– সেঁউতি খোঁজো–ডিঙি যাবে এবার–ডুবু-ডুবু হয়ে আসছে।

সেবার সেঁউতি খুঁজতে গিয়াই বিপন্ন হইয়াছিলাম। এবার অতি কষ্টে আধখোল ভরতি জলের মধ্যে হাতড়াইয়া সেঁউতি বাহির করিয়া দুই হাতে প্রাণপণে জল হেঁচিতে লাগিলাম। দেহে যেন মত্ত হস্তীর বল আসিল। আমার অক্ষমতার জন্যে আমার দুই বালক-বন্ধু জলে ডুবিয়া মারা যাইবে? তাহা কখনো হইতে দিব না। ভগবান আমার সহায় হউন। অনেকখানি জল হেঁচিয়া ফেলিলাম। সেই অবস্থাতেও আমার ঘাম বাহির হইতেছিল। ভগবান আমার প্রার্থনা শুনিলেন। ডিঙি অনেকটা হালকা হইয়া গেল। মনু বা নিবারণ কেহ কথা বলে নাই। এবার নিবারণ বলিয়া উঠিল–সাবাস!

কী?

ডিঙি হালকা লাগছে।

কেন, বলছিলে যে আমার কিছু করবার নেই?

বেশ করেছ।

ডিঙি ভেড়াতে পারবে ডাঙায়?

আলবৎ। স্থির জলে এসে পড়েছি, আর ভয় নেই। নদীর সব জায়গায় সমান স্রোত কাটিয়ে এসেছি।

আরও এক ঘণ্টা পরে আমাদের পাড়ে ডিঙি আনিয়া লাগাইয়া দিল নিবারণ।

একদিন রাত্রে মনু আমায় চুপি চুপি বলিল–এক জায়গায় যাবে? কাউকে না বলে বেরিয়ে চলো–

দ্বিতীয়বার অনুরোধের অপেক্ষা না করিয়া উহার সঙ্গে বাড়ির বাহির হইলাম। দেখিলাম, একটু দূরে নিবারণ দাঁড়াইয়া। যেখানে নিবারণ সেইখানে মস্ত বড়ো কিছু আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে

নিবারণ বলিল–বাবু, চলো রাত্রে একটা কাজ করে আসি–

কী কাজ এত রাত্রে?

বাঘ মারব।

বাঘ কী করে মারবে? বন্দুক কই?

দেখবে চলো।

তিনজনে গিয়া খালের নীচে ডিঙিতে চড়িলাম। ছোটো খাল, দুই ধারে গোলপাতার জঙ্গল নত হইয়া জল স্পর্শ করিয়াছে। জোনাকি-জ্বলা অন্ধকার রাত্রে এই নিবিড় বনভূমির শোভা এমনভাবে কখনো দেখি নাই। মনু ও নিবারণকে মনে মনে অনেক ভালোবাসা জানাইলাম আমাকে এভাবে জঙ্গলের রূপ দেখাইবার জন্য।

এক জায়গায় ডিঙি বাঁধা হইল কেওড়া গাছের গুঁড়িতে।

আমি বলিলাম–অন্ধকারে নামব?

নিবারণ গিয়া খোলের ভিতর হইতে দুইটা মশাল বাহির করিল। মনু ও আমি দুইটা মশাল হাতে আগে আগে চলি, ও আমাদের পিছনে পিছনে আসে। কিছু দূরে জঙ্গলের মধ্যে গিয়া নিবারণ হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেল! আনন্দের সুরে বলিয়া উঠিল– বোধ হয় হয়েছে।

মনু বলিল–পড়েছে?

তাই তো মনে হচ্ছে।

এগিয়ে চলো।

একটা গাছের তলায় দেখি অদ্‌ভুত উপায়ে পাতা একটা ফাঁদে একটা ছোটো বাঘের ছানা ধরা পড়িয়া বেড়ালের মতো মিউমিউ করিতেছে। বড়ো একটা গাছের গুঁড়ির দুই দিক দিয়া দুইটা তার বাঁধিয়া সামনের ফাঁদের ফাঁস বাঁধা। একটি বড়ো তার গাছটি বেষ্টন করিয়া ফাঁদ পর্যন্ত গিয়াছে। এই তারের কাজ বোধ হয় ফাঁদের ফাঁস শক্ত ও আঁটো করিয়া রাখা। বাঘ বা যেকোনো জানোয়ার অন্ধকারে এই স্থান দিয়া যাইবার সময় তারটি ঢিলা করিয়া দিবে, দিলেই তৎক্ষণাৎ নীচের ফাঁদে ফাঁস পড়িয়া যাইবে এবং জন্তুটি ফাঁসের মধ্যে আটকা পড়িবে।

আমাদের অত্যন্ত নিকটে আসিতে দেখিয়া ধৃত জন্তুটি লম্ফঝম্প দিতে আরম্ভ করিল। আমরা সকলেই বিষম আগ্রহে ও কৌতূহলে ছুটিয়া কাছে গেলাম। শুনিতে পাইলাম জন্তুটির ক্রুদ্ধ গর্জন।

হঠাৎ নিবারণ ও মনু হতাশ সুরে বলিয়া উঠিল–এঃ—

www.bengaliebook.com

বলিলাম–কী? পালাচ্ছে নাকি?

নিবারণ বলিল–যাদু পালাবে সে-পথ নেই। কিন্তু দেখছ না—

দেখছি তো! বাঘের বাচ্ছা!

বাঘের বাচ্ছা অত সোজা নয়। মিথ্যে মিথ্যে ফাঁদ পাতা পরিশ্রম।

এঃ—

কী এটা তবে?

জানোয়ার চেনো না? এটা কী জানোয়ার ভালো করে দেখে বলো না?

বাঘের বাচ্ছা।

ছাই! তাহলে তো দুঃখ করতাম না।

মনু বলিল–ছুঁচো মেরে হাত কালো!

বলিলাম–তবে কী বেড়াল?

ঠিক ধরেছেন। সাবাস–এটা বনবেড়াল, তবে খুব বড়ো বনবেড়ালও নয়। এর চেয়েও বড়ো বনবেড়াল সুন্দরবনে অনেক আছে দেখতে পাবে। এটা ছোটো বনবেড়াল। সব মাটি!

বাঘ মারা পড়ে কিনা এমন ফাঁদে–আমি উহাকে জিজ্ঞাসা করি।

ও বলিল–নিশ্চয়ই।

এইরকম বাঘ?

না। দেখলে তোমার দাঁত লাগবে এমন বড়ো।

এখন এই বনবেড়ালটা নিয়ে কী করবে? ছেড়ে দেবে?

ও তো এখুনি ছাড়তে হবে। বাড়ি নিয়ে গেলে বকুনি শুনবে কে?

ফাঁস খুলিয়া বনবিড়ালটিকে মুক্ত করিয়া দিবার সঙ্গেসঙ্গে সেটা পালাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। উহার একখানা পা সম্ভবত খোঁড়া হইয়া গিয়াছিল। আমি কাছে গেলাম ধরিতে, কিন্তু সেটার গায়ে হাত দিবার আগেই থাবা তুলিয়া ফ্যাঁচ করিয়া কামড়াইতে আসিল।

মনু বলিল– আঁচড়ে কামড়ে দেবে, বনের জানোয়ার, খবরদার ওর কাছেও যেও না।

তা তো যাব না, কিন্তু বাঘের কী হল?

নিবারণ জানে।

নিবারণ মুখ ফিরাইয়া বলিল–বাঘ দেখাব তবে ছাড়ব, বড় হাসাহাসি হচ্ছে!

মনু বলিল–না ভাই, আমি হাসিনি। আমি তো জানি তোমায়।

আজই পারব না, তবে বাঘ দেখাবই। তবে আমার নাম নিবারণ।

বলিলাম– বেশ দেখিও। ফাঁদটা পাতো দেখি।

রাত্রে?

দোষ কী?

আজ রাত্রেই এ ফাঁদে বাঘ এনে ফেলতে পারি, তবে একটা টোপ চাই তাহলে।

কীসের টোপ? ছাগল?

ধৎ! বড়ো বাঘে ছাগল খেতে আসবে না, ও আসে কেঁদো বাঘে। হয় গোরু নয়তো দু বছরের বাছুর; কিন্তু মোষ হলে সবচেয়ে ভালো টোপ হত– মোষ বা মোষের বাচ্ছা। চলো আজ রাত্রে ফিরি। কাল সকালে ফাঁদ আবার পাতব।

নিবারণের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই হঠাৎ এক ভীষণ গর্জন শোনা গেল বাঘের। যেন হাঁড়ির ভেতর হইতে শব্দ বাহির হইতেছে নিকটে কোথাও। সমস্ত বন যেন কাঁপিয়া উঠিল। নিবারণ বলিল–আরে!

মনু বলিল–গাছে উঠবে?

না দাঁড়াও, আবার ডাকবে এখুনি। আগে বুঝি ও কী করছে।

তখন আবার সেই বিকট গর্জনধ্বনি। কেওড়া গাছের ডালপালা যেন কাঁপিয়া উঠিল। এত রাত্রে গভীর বনমধ্যে বাঘের ডাক কখনো শুনি নাই। এ এক অদ্‌ভুত অভিজ্ঞতা।

আবার একবার গর্জন। এবার খুব যেন কাছে।

www.bengaliebook.com

২. কেওড়া গাছ

মনু আমার হাত ধরিয়া একটা কেওড়া গাছে উঠিল। নিবারণ আমাদের পাশের একটা গরান গাছের আড়ালে লুকাইয়া দাঁড়াইল, গাছে উঠিল না। খানিকটা পরে সে দেখি গাছের গুঁড়ির ওদিক হইতে এদিকে ঘুরিতেছে। আমরা গাছে উঠিবার সময় জ্বলন্ত মশাল দুইটি মাটিতে নামাইয়া রাখিয়াছি, তাই বোধ হয় নিবারণ বাঁচিয়া গেল।

মনু আমার গা ঠেলিয়া নিঃশব্দে আঙুল দিয়া আমাদের ডান দিকের একটা বেতঝোঁপের দিকে দেখাইল। মশালের আলোতে দেখিয়া আমার গা কেমন করিয়া উঠিল। সমস্ত হাত-পা অবশ হইয়া গেল। প্রকান্ড একটা বাঘ ডান দিকের বেতঝোঁপ হইতে বাহির হইয়া খানিকটা আসিয়া দাঁড়াইয়া নিবারণের দিকে চাহিয়া আছে। মশালের আলো পড়িয়া উহার চক্ষু দুইটি জ্বলিয়া উঠিল। আবার নিবিয়া গেল। আবার জ্বলিয়া উঠিল। মনু জাতে মগ, সাহসী বীর বটে! ও দেখি নামিয়া পড়িতে চাহিতেছে নিবারণকে বাঁচাইবার জন্য। অথচ আমি জানি মনু সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। মনু যদি লাফায়, তবে আমাকেও লাফাইয়া পড়িতে হইবে–আমি গাছে বসিয়া থাকিব না। কিন্তু কী লইয়া নামি? মাথার উপরের দিকে একটা মোটা ডালের সন্ধানে চাহিলাম। মরিতে হয় তো যুদ্ধ করিয়া মরিব। এমন সময় এক অদ্‌ভুত দৃশ্য চোখে পড়িল। মনু উত্তেজিতভাবে আমাকে আর এক ঠেলা মারিল। সম্মুখে চাহিলাম। ওদিকের বড়ো কেওড়া গাছের ওপার হইতে একটা বাঘিনী বাহির হইয়া আমাদের গাছের তলার দিকে আসিতে আসিতে দাঁড়াইল, সম্ভবত জ্বলন্ত মশালের আলোয় ভয় পাইয়া। ঠিক বলা কঠিন। সঙ্গেসঙ্গে বাঘটা আরও আগাইয়া আসিল। তারপর দু-টিতে একত্র হইতেই বাঘিনী জিভ বাহির করিয়া বাঘের গা চাটিতে লাগিল। নিবারণ ঠিক উহাদের পাশেই কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়াইয়া আড়ষ্ট হইয়া আছে। উহার দিকে ইহারা দু-টিতে যেন অবজ্ঞাভরেই দৃষ্টি দিলে না। না, বেঁচে গেল এযাত্রা। বাঘ ও বাঘিনী ক্রমশ খালের উজানের জঙ্গলের দিকে চলিয়া গেল। আমরা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। নিবারণের হাতের ইশারায় আমরা গাছ হইতে নামিলাম।

মনু বলিল–খুব বেঁচে গিয়েছ!

নিবারণ শুকনো মুখে হাসি আনিয়া বলিল–ভারি।

আমি বলিলাম–নিবারণ, গিয়েছিলে আর একটু হলে।

তা আর না!

ভয় করছিল?

করবে না? সাক্ষাৎ যম। জানিস মনু, আমি ভাবছিলাম যদি বাঘে থাবা মারে, তবে কোথায় আগে মারবে। কানে যেন না মারে, ক-দিন থেকে আমার কানে ব্যথা। আবার ভাবছি, বাবুদের ওই নতুন ছেলেটা কখনো বনে আসেনি, ওটাকে কেন মরতে নিয়ে এলাম।

আমরাও চুপ করে বসে থাকতাম না নিবারণ। মনু লাফ দিয়েছিল আর একটু হলে।

মনু লাফিয়ে কী করত? নিজে মরত, তোমাকেও মারত বই তো নয়!

অনেক রাত্রে আমরা বাড়ি আসিলাম। পরদিন নিবারণ আসিয়া আমাদের ডাকিল।

বলিলাম–কোথায়?

নেমন্তন্ন খেতে চলো।

কোথায় আবার?

মনু আর তুমি চলো।

তিনজনেই আমরা চলি। অনেক দূর চলি খালের পথে। সুন্দরবনে ডিঙি ছাড়া চলার পথ নাই। সব দিকে ডিঙি, সব দিকে খালের পথ। দুইটি বাঁক ছাড়াইয়া দেখি, একটা উঁচু ট্যাঁকে অনেক লোক একত্র হইয়া কী উৎসব করিতেছে। ডিঙি হইতে নামিতে তাহাদের ভিতর হইতে কয়েকজন আগাইয়া আসিয়া আমাদের বলিল–আসুন বাবু, আপনাকে এনেছে বুঝি নিবারণ? এসো গো মনু সাহেব–

মনু বলিল–আমি সাহেব নই—

তাহারা হাসিয়া বলিল–বেশ, চলে এসো। তুমি যা আছ, তা আছ।

নিবারণকে বলিলাম– কে এরা?

আমাদের গাঁয়ের লোক। আমাদের গাঁয়ের নাম ঝাউতলা। ওরা আজ এখানে এসেছে বনবিবির দরগায় পুজো দিতে।

একজন বলিল–সেজন্যেই বাবু ও জায়গাটার নাম বনবিবির ট্যাঁক।

আমি উহাদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে আলাপ করিলাম। উহারা বেশ সরল, অমায়িক। একজনের নাম কালু পাত্র। বয়স আমার বাবার চেয়েও বেশি বলিয়া মনে হইল।কিন্তু

একেবারে ছোটো ছেলের মতো সরল। আমার সঙ্গে কালু পাত্রের বড়ো ভাব হইয়া গেল। কালু পাত্র আমাকে সঙ্গে করিয়া গিয়া দেখাইল, একটা প্রাচীন কেওড়া গাছের তলায় চার পাঁচটি ছাগল বাঁধা। অনেক মেয়ে-পুরুষ গাছতলায় বসিয়া গল্প করিতেছে। একটা হাঁড়িতে অনেকখানি খেজুর গুড়। এক কলসিভরতি দুধ।

নিবারণকে বলিলাম–পুজো করবে কে?

আমরাই।

পুরুত আসেনি?

না, পুরুত থাকে না। কালু পাত্র সব করবে।

বাজনা বাজিয়া উঠিল। তিনটি ঢোল এবং একাট কাঁসি বাজিতেছিল। একটি মেয়ে গরানফুলের মালা ঢুলির গলায় পরাইয়া দিল। উহাই নাকি নিয়ম। আজ ঢুলিকে সম্মান দেখানো মস্ত বড়ো নিয়ম। ইহাদের পূজার কিছু বুঝিলাম না। কোনো নিয়ম নাই। পাঁচটা ছাগল প্রাচীন দরগাতলায় বলি দেওয়া হইল। সেই মাংস পাক হইল।

কালু পাত্র আমার কাছে আসিয়া বলিল–বাবু, ঝাল খান?

বেশি নয়। কম করে দিতে বলো।

এটা আমাদের বছরের পুজো। বনবিবির দরগায় পুজো না দিয়ে কোনো কাজ হবে না আমাদের।

কী কাজ?

যেকোনো কাজ। আমরা এই জঙ্গলের লোক। বনবিবিকে তুষ্ট না রাখলে বাঘে নিয়ে যাবে।

বিশ্বাস করি না।

বিশ্বাস করেন না, ও-কথা বলবেন না বাবু।

কেন?

আমার চোখে দেখা। এখানে বাস করে বনবিবিকে মানিনে যিনি বলেন, তাঁর মস্ত বড়ো বুকের পাটা।

আমি তো বলছি।

আপনি বিদেশি লোক, আপনার কথা আলাদা। আমরা মোম-মধু সংগ্রহ করি, কাঠ কাটি, এই ভাবে পয়সা জোগাড় করি। জঙ্গলের মধ্যে আমাদের মুখের অন্ন। বনবিবিকে পুজো না দিলে চলে?

আমি বনবিবিকে পুজো করব, যদি তিনি আমার একটা কাজ করেন।

কী কাজ?

সে এখন বলব না। তোমাকে বলব গোপনে।

তারপর সে কী নাচ আর ঢুলির বাদ্য। ঢুলিরাও নাচে, লোকজনও নাচে। অনেক বেলায় সেই প্রাচীন কেওড়াতলায় আমরা খাইতে বসিয়া গেলাম। আমাদের মাথার উপর নীল আকাশ। নীচে দিয়া ভাটার টানে খালের জল কলকল করিয়া পাশের নদীর দিকে চলিয়াছে। নিবারণ ও কালু পাত্র পরিবেশন করিল। মোটা চালের রাঙা ভাত, বেগুনপোড়া ও প্রসাদী মাংস। মাংস প্রচুর দিল, যে যত খাইতে পারে। মেয়েরা আসিয়া আমাদের কাছে দাঁড়াইয়া যত্ন করিয়া আমাদের খাওয়ার তদারক করিতেছিলেন।

একটি মেয়ে আমাকে বলিলেন–তুমি কে বাবা? কোথায় থাক?

মনু বলিল–আমাদের বাড়ি। কেন?

মেয়েটি থতমতো খাইয়া গেলেন। অপ্রতিভ মুখে বলিলেন–না, তাই বলছি।

মনু বলিল–যাও এখান থেকে—

আমি বাধা দিয়া বলিলাম–কেন, উনি মন্দ কথা কী বলেছেন?

মনু উত্তেজিত স্বরে বলিল–তুমি চুপ করো।

কেন চুপ করব?

আলবৎ চুপ করবে।

মুখ সামলে কথা বলো, মনু।

www.bengaliebook.com

তুমি মুখ সামলে কথা বলো কিন্তু বলে দিচ্ছি। জান কি, কোথায় এসেছ?

জানি বলেই বলছি! তোমরা ডাকাত, আমাকে চুরি করে এনেছ। আনোনি? তুমিও তাদের সাহায্য করেছ। আমার মা-বাপ নেই, তাঁদের জন্য আমার মন কাঁদে না? তুমি ভেবেছ কী মনু?

যিনি এনেছেন, তাঁর কাছে এসব কথা বলো ভাই, আমি আনিনি।

তুমি জান না কে এনেছে? তুমি কেন তাকে অনুরোধ করো না আমাকে ছেড়ে দিতে?

আমি ছেলেমানুষ, আমার কথা কে শুনবে? তবে একটা কথা তোমায় বলে দিচ্ছি, কখনো আমায় ডাকাত–একথা আর বলবে না। আমি তোমাকে বন্ধুর মতো ভালোবাসি, তাই বলছি একথা।

বললে না হয় তোমরা আমাকে মেরে ফেলবে, এ ছাড়া আর কী করবে?

আমাদের কাছে যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা বেগতিক বুঝিয়া অনেকে সরিয়া পড়িল ইতিমধ্যে। কিন্তু সেই মেয়েটির কথা কখনো ভুলিব না। তিনি আমাদের কাছে আসিয়া মনুর ও আমার ঝগড়া থামাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

আমাকে বার বার বলিলেন–চুপ করো বাবা–

না, কেন চুপ করব? আমি ভয় করি না।

থামো বাবা থামো!

নিবারণ আসিয়া মনুকে হাত ধরিয়া অন্য দিকে লইয়া গেল। সেই সময় মেয়েটিও চলিয়া গিয়া অন্য মেয়েদের ভাত খাওয়াইতে লাগিলেন। এক সময় আড়চোখে উহাদের দিকে চাহিয়া দেখিয়া মেয়েটি চট করিয়া আমার কাছে আসিলেন। আমার হাত ধরিয়া বলিলেন–এসো—লুকিয়ে–

আমরা গিয়া একটি গোলপাতার ঝোপে দাঁড়াইলাম। তাঁহার প্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া আমার মাকে দেখিতে পাইলাম। এই বিজন অরণ্যের মধ্যেও বিশ্বের পিতা ভগবান এমন স্নেহরস পরিবেশনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বলিলাম–কী মা?

তুমি কে বাবা?

আমার নাম নীলু রায়, আমার দাদামহাশয়ের নাম ভৈরবচন্দ্র মজুমদার, বাড়ি পলাশগাছি, জেলা খুলনা। আমাকে ওরা ধরে এনেছে।

কী করে?

আমি সব খুলিয়া বলিলাম। মায়ের মতো স্নেহ পাইয়া এতদিন পরে আমার বড়ো কান্না পাইল। আমার বাবা নাই, জ্ঞান হইয়া অবধি মাকে ছাড়া আর কাহাকেও চিনি না। আমার সে মা আমার অভাবে কী কষ্টই না জানি পাইতেছে! রোজ রাত্রে মার কথা ভাবিয়া আমি কাঁদি। ভগবান ছাড়া আর কে সে-কথা জানে!

মেয়েটি আমার চোখের জল নিজের আঁচল দিয়া মুছিয়া দিলেন।

চুপ করো বাবা, কেঁদো না ছিঃ—

আমি সেজন্যে কাঁদিনি। শুধু ভাবছি মা কেমন করে আছেন—

সব বুঝেছি। আমার আগেই সন্দেহ হয়েছিল। একটা কথা বলি—

কী?

তোমার হাতে টাকা আছে?

কিছু না। গলায় সোনার হার ছিল, সে ওরা খুলে নিয়েছে।

মনু জানে?

না। ও ভালো ছেলে। আমাকে খুব ভালোবাসে।

মেয়েটি আঁচলের গিরো খুলিয়া আমার হাতে দুইটি টাকা দিয়া বলিলেন–এই নাও, রাখো।

আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম–না, এ আপনি রাখুন।

নাও না। আমার কথা শোনো।

না।

আবার একগুঁয়েমি। ছিঃ, রাখো!

আমি মেয়েটির মুখের দিকে আবার চাহিলাম। আমার মায়ের গলার স্নেহ-ভর্ৎসনার সুর। না, মেয়েটির মনে কষ্ট দিতে পারিব না, যেমন পারিতাম না আমার মায়ের মনে।

মেয়েটি বলিলেন–এই টাকা যত্ন করে রাখবে। কাজে লাগবে এর পরে।

কী আর কাজে লাগবে! ওরা দেখলে কেড়ে নেবে। আচ্ছা ওরা কী করে–আমাকে নিয়ে কী করবে?

শুনেছি হাটে বিক্রি করে।

কোথাকার হাটে?

যাদের ধরে, তাদের কেনা-বেচার হাটে বেচে। এরা অমন কেনে-বেচে, আমি শুনেছি। মনুর কোনো দোষ নেই। ওর সঙ্গে ভাব রেখো। আমি চেষ্টা করব তোমাকে ছাড়াতে। কিন্তু আমরা ওদের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করি। ওদের ভয়ে আমাদের কিছু করবার জো নেই। ওদের তুষ্ট না রাখলে সুন্দরবনে আমাদের কাজ চলবে না। তবুও আমি বলছি, আমি চেষ্টা করব। তোমাকে উদ্ধার করবার যা চেষ্টা দরকার, তা আমার দ্বারা হবে। একথা কিন্তু কারো কাছে প্রকাশ করবে না, কেমন?

ঠিক আছে।

আমি যাই আজ। দাঁড়ান, আপনাকে প্রণাম করি।

না, আমার পায়ে হাত দিও না। আমরা ছোটো জাত।

আপনি মা, মায়ের আবার জাত কী? দাঁড়ান।

আমি প্রণাম করিলাম, তিনি চিবুকে হাত দিয়া চুমু খাইলেন, মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

অনেকদিন পরে মনে বল ও আনন্দ পাইলাম। আজ আমার বনবিবির দরগায় আসা সার্থক। কিংবা দয়াময়ী বনবিবিই একটি অসহায় ছোটো ছেলের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছিল, আমরা নিবারণের সঙ্গে ফিরিলাম। মনুর দিকে চাহিয়া বলিলাম–আমার ওপর রাগ করেছ ভাই?

মনু বলিল–না।

আমি অন্যায় কথা বলিনি।

ওর সামনে বললে, তাই রাগ হয়েছিল। যা হোক, তুমিও কিছু মনে কোরো না।

ব্যাপারটা মনুকে সব খুলিয়া বলি নাই। কী জানি কী মনে করিবে হয়তো। মগ ডাকাতের ছেলে, উহার মনের খবর আমি সব কি জানি?

জলের ধারের জঙ্গলে হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল। হেঁতাল গাছের ঝোঁপ ঠিক জলের ধারেই। কী সুন্দর সাদা ফুল ফুটিয়া আছে ঝোঁপের মাথায়! আমি যেমন সেদিকে চাহিয়াছি, অমনি ঝোঁপের ভিতর হইতে নিঃশব্দে কী একটা আসিয়া জলের ধারে দাঁড়াইল। কালোমতো কী একটা জানোয়ার। চুপ করিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া আমার সন্দেহ হইল। আমি মনুকে দেখাইব ভাবিতেছি, এমন সময় সেটা জলে ঝাঁপ মারিল এবং নৌকার দিকে সাঁতরাইয়া আসিতে লাগিল।

চিৎকার করিয়া বলিলাম–মনু! নিবারণ!

উহাদের সাড়া নাই। ভাটার টানে নৌকা আপনা-আপনি চলিয়াছে, উহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে নাকি?

এমন সময় নিবারণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সবেগে দাঁড়ের বাড়ি মারিল জানোয়ারটার মাথায়। সঙ্গেসঙ্গে ভীষণ গর্জন বাঘের এবং নিবারণ ও মনু দুইদিক হইতে জানোয়ারটার মাথায় দুড়দাড় মারিতে লাগিল। বাঘটা মুখ ঘুরাইয়া ডাঙার দিকে চলিল। তাহার দেহের বেগ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। ডাঙায় উঠিয়া সেটা হেঁতাল ঝোঁপের মধ্যে মিশিয়া গেল। তারপর একটা আর্ত চিৎকার করিয়া উঠিল।

এতক্ষণে নিবারণ বলিল– উঃ, আজ তোমাকে নিয়েছিল আর একটু হলে!

মনু বলিল–ঝগড়া করতে ব্যস্ত ছিলে, এদিকে যে হয়ে গিয়েছিল! নিবারণ আর আমি দু-জনেই টের পাই। আমরা দাঁড় হাতে তৈরি ছিলাম। তুমি চেঁচিয়ে উঠে সব মাটি করলে। আরও কাছে এলে ওটার মাথার খুলি গুড়ো করে দিতাম।

নিবারণ বলিল–আমার মনে হয় ওটা ঘায়েল হয়েছে। কাল খুঁজতে হবে এই ঝোপে। ওঃ, আজ তোমাকে যমের মুখ থেকে বাঁচানো হয়েছে।

মনু বলিল–উঃ, আর একটু হলে কী সর্বনাশ হত!

দেখিয়া খুশি হইলাম–আমার বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য উহারা সকলেই সুখী। পরদিন সকালে একটু রৌদ্র উঠিলে আমরা ডিঙি করিয়া সেই হেঁতালঝোঁপ খুঁজিতে গেলাম। অনেক দূর পর্যন্ত খুঁজিয়াও কোথাও মৃত বাঘের চিহ্নও পাইলাম না। নিবারণ এক স্থানে রক্তের দাগ পাইল বটে, বাঘের থাবার দাগও দেখা গেল কিন্তু কিছু দূর পর্যন্ত, তারপর যেন বাঘটা হঠাৎ আকাশপথে উড়িয়া গিয়াছে।

মনু বলিল–কী ভাই নিবারণ, বাঘ কোথায় গেল?

তাই তো! পায়ের দাগ কোথায় গেল?

বাঘ এখানেই আছে, কোথাও যায়নি।

তা হয় তো খুঁজে বার করো।

নিবারণ এইবার খুঁজিয়া খালের ধারের কাদায় আসিয়া কী একটা চিহ্ন দেখিয়া উত্তেজিত সুরে বলিল–শিগগির এসো, বাঘ পাওয়া গেছে।

আমরা ছুটিয়া গেলাম। কই বাঘ? কোথায়? কিছুই তো আমাদের চোখে পড়ে না। নিবারণ একটা শুকনো হিজলপাতার দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল–ওই দেখছ না! রক্তমাখা হিজলপাতাটা বাঘের থাবায় উলটে গিয়েছে? থাবার রক্ত?

মনু বলিল–বাঘ কোথায়?

–বাঘ ওপারে! ডিঙিতে ওঠো– কোথায় আছে, আমি বুঝতে পেরেছি।

ডিঙিতে খাল পার হইয়া মস্ত বড়ো একটা বেতঝোঁপ। তাহার পাশে একটা ভাঙা বাড়ির ইটের স্তূপ। সেই ঘন জঙ্গলে ইটের বাড়ির ধ্বংসস্তূপ কোথা হইতে আসিল। আমি খুব অবাক হইয়া গেলাম। নিবারণকে বলিলাম কথাটা? তাহার বা মনুর এ সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহল দেখিলাম না।

নিবারণ বলিল–অত কথায় আমাদের দরকার কী বাপু? যা করতে এসেছ তাই করো।

দেখতেও তো এসেছি।

দেখবে আবার কী?

কারা এই জঙ্গলে বাড়ি করেছিল, এটা জানবার কথা নয়?

বাপ-দাদাদের মুখে শুনেছি, দেবতারা করেছিল।

দেবতাদের কী গরজ?

তা জানি নে বাপু, যা শুনেছি তাই বললাম।

ব্যাস! ইহার বেশি উহাদের কৌতূহলের দৌড় নাই, ও কী করিবে? আমরা সেই ইষ্টক স্তূপে উঠিয়া এখানে-ওখানে খুঁজিতেছি, এমন সময়ে নিবারণ বিজয়গর্বে চিৎকার করিয়া বলিল–ওই যে!

গিয়া দেখি এক জায়গায় ইটের আড়ালে বাঘটা মরিয়া পড়িয়া আছে। হাঁ করিয়া উঁচু দিকে মুখ করিয়া দাঁতের পাটি বাহির করিয়া চিত হইয়া শুইয়া আছে।

মনু এক লাফে বাঘটার কাছে যাইতেই নিবারণ সতর্ক চিল্কারে তাহাকে সাবধান করিয়া দিল।

মরবে! মরবে! খবরদার।

তাই মনু বাঁচিয়া গেল।

সে এক অদ্ভুত ও ভীষণ দৃশ্য। মৃত বাঘটা হঠাৎ এক লম্ফে চিত অবস্থা হইতে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। পরক্ষণেই একটা লাফ দিল আমার দিকে।

আমার দূরত্ব ছিল তাহার লাফের পাল্লার বাহিরে, তাই রক্ষা পাইলাম। মনু মরিত যদি নিবারণ তাহাকে সতর্ক না করিত। বাঘটার সেই শেষ লাফ– সেই যে মাটিতে পড়িয়া গেল, আর উঠিল না। আমরা দেখিলাম, নিবারণ আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ। সে এখনও আমাদের বারণ করিতেছে–খবরদার, বিশ্বাস নেই, ও হল সাক্ষাৎ যম, ওর কাছেও যেও না। আগে দেখি ভালো করে—

নিবারণ ভূপতিত ও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত বাঘটার গায়ে একটা ঢিল মারিল।

আমি বলিলাম–নট নড়নচড়ন নট কিচ্ছ—

নিবারণ আর একটা ঢিল ছুড়িল। এবারও বাঘ নড়িল না। তখন আমরা সবাই মিলিয়া কাছে গেলাম। বাঘের মাথার পিছন দিকে নিবারণের দাঁড়ের জবর ঘা লাগিয়া খুলি চিরিয়া ঘিলু ঝরিতেছে। বাঘের শক্ত প্রাণ বটে! এ অবস্থাতেও অমন লাফ দিতে পারা সোজা শক্তির কথা! মস্ত বড়ো বাঘ। আমরা তিনজনে সেটাকে টানিয়া-হেঁচড়াইয়া

জলের ধারে আনিলাম। ডিঙিতে উঠানো বড়ো কঠিন কাজ। এক হাঁটু কাদার মধ্য দিয়া অত বড়ো ভারি মৃত জন্তু ডিঙি পর্যন্ত নেওয়াই মুশকিল।

বলিলাম–এটা এখানে থাক, চলো লোক ডেকে আনি—

নিবারণ বলিল–তা থাকবে না, চামড়া নষ্ট হবে—

কীসে?

এখুনি শকুন পড়বে এর ওপর, চামড়াখানা যাবে। সুন্দরবনে শেয়াল নেই।

তবে আমি আর মনু থাকি, তুমি যাও।

এই বনে তোমাদের রেখে যেতে সাহস করিনে। তোমরা জঙ্গলের জান কী? কতরকম বিপদ ঘটতে পারে, তুমি কী খবর রাখ? দেখি দাঁড়াও, একটা মোটা ডাল–

এমন সময় খাল দিয়া আর একখানা ডিঙি যাইতে যাইতে আমাদের ও-অবস্থা দেখিয়া থামিল। নিবারণের মুখে সব শুনিয়া বলিল–বা রে ছোকরার দল। বলিহারি সাহস! সুন্দরবনে দাঁড় দিয়ে বাঘ মারা এই নতুন শোনা গেল বটে।

আমরা বলিলাম বাঘের মৃতদেহটা ডিঙিতে তুলিতে সাহায্য করিতে। তাহারা আমাদের সঙ্গে বাঘটা আমাদের ডিঙিতে তুলিয়া দিয়া গেল।

আমি তাহাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম–এ কোথাকার নৌকো?

সরষেখালির।

সে কত দূর?

পাঁচ-ছ ক্রোশ এখান থেকে।

যাবেন কোথায়?

আমরা বড়ো চরের ট্যাঁকে মাছ ধরতে যাব। তুমি কোথায় থাক বাবু?

মনু আমার গায়ে ধাক্কা দিয়া বলিল–চলো চলো, বাজে কথা বলে লাভ নেই। ও আমাদের বাড়ির ছেলে। কেন, কী দরকার তোমাদের?

কেন, বললে দোষ কী?

না, বলার দরকার নেই। আমি ভালো ভাবেই তোমায় বলছি, ওতে আমাদের বিপদ হতে পারে।

কী বিপদ?

পুলিশে ধরবে আমার বাবাকে। বুঝলে?

আমি কথা বলিলাম না! বুঝিলাম মনুর সঙ্গ আমাকে ছাড়িতে হইবে। ও আমায় নজরবন্দি রাখিয়াছে–পাছে ওর বাবা বিপদে পড়েন, পাছে আমি পালাই। এ জীবন আমার মন্দ লাগিতেছে না। মনুকে আমি ভাইয়ের মতো ভালোবাসি। কিন্তু আমার মায়ের কাছে যাইতে আমার কী আকুল আগ্রহ, ও তাহার কী বুঝিবে?

সেদিন হইতে মনু আমার প্রতি খুব প্রসন্ন হইল। আমাকে ভাগ না দিয়া কোনো জিনিস খায় না, কোথাও গেলে আমায় সঙ্গে না লইয়া যায় না।

একদিন আমাকে বলিল–তোমাকে একটা নতুন জিনিস দেখাব–চলো যাই–

সেদিন নিবারণ আমাদের সঙ্গে ছিল না, শুধু আমি আর ও। আমি দাঁড় টানি, ও হাল ধরে। অবশ্য খালের ভিতর দিয়া যাইতে হাল ধরিতে কোনো কষ্ট নাই।

কিছু দূরে গিয়া দু-জনে জঙ্গলের মধ্যে নামিলাম। বড়ো বড়ো গোলপাতা গাছ জঙ্গলের ধারে নত হইয়া আছে। বেত ডাঁটার অগ্রভাগ ভাটার টানে দুলিতেছে। বাতাবি লেবুর মতো সেই ফলগুলি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িয়া গাছতলায় গড়াগড়ি যাইতেছে। বাঁদরের পাল হুপ হুপ করিয়া এগাছে-গাছে লাফালাফি করিতেছে। ইহারা মুখপোড়া হনুমান জাতীয় বানর নয়, রাঙামুখ বুপীবাঁদর। হনুমান হইতে আকারে কিছু ছোটো।

একস্থানে গিয়া মনু বলিল– চেয়ে দেখো, তুমি অবাক হয়ে যাবে।

কী দেখব?

এগিয়ে চলো।

সত্যিই অবাক কান্ড!

সেই ঘন বনের মধ্যে প্রকান্ড একটা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। শুধু একটা বাড়ি নয়, আশপাশে আরও অনেক বাড়ির চিহ্ন দেখা যাইতেছে। বড়ো বড়ো পাথরের খিলান

খসিয়া পড়িয়াছে, দুর্ভেদ্য বেতজঙ্গলে পাথরে কড়ির হাঙরমুখ ঢাকা পড়িয়াছে। মনু বলিল–আরও দেখবে?

হুঃ।

চলো রানির জঙ্গল দেখিয়ে আনি—

কত দূর?

এখান থেকে দূর আছে। বাঘের ভয় আছে পথে।

–চলো যাব।

কিন্তু বেশি দূর যাইতে-না-যাইতে আর একটি বড়ো বাড়ির ধ্বংসস্তূপে আমাদের পথ আটকাইয়া গেল। বড়ো বড়ো পাথর ও ইটের জমাট চাঁই, বেতলতার শক্ত বাঁধনে আবদ্ধ। এক স্থানে একটা মন্দির। মন্দিরের ছাদটা দাঁড়াইয়া আছে, অন্ধকার গর্ভগৃহে মনে হইল এখনও বিগ্রহ জীবন্ত।

মনু তাড়াতাড়ি বলিল–ও কি? কোথায় যাও? ঢুকো না, ঢুকো না। আমি ততক্ষণে ঢুকিয়া পড়িয়াছি। মন্দিরের বহু শতাব্দীর জমাট অন্ধকারে দেবতার বেদি আবিষ্কার করিতে পারিলাম, মনে হইল কোন অতীতকালের বাংলায় পূজাবেদিতে অর্ঘ্য সাজাইয়া নিবেদন করিতে আসিয়া পথভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি–সে অতীত দিনে ফিরিয়া যাইবার সকল পথ আজ আমাদের রুদ্ধ।

কে আমাকে হাত ধরিয়া সে বাংলায় ফিরাইয়া লইয়া যাইবে?

কেহ নাই।

আমাদের সে অতীত দিনের পূর্বপুরুষদের আজ আমরা আর চিনিতে পারিব না।

তাহারাও আমাদের আর চিনিতে পারিবে কি তাহাদের বংশধর বলিয়া?

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে কীসের গর্জন শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। মনু বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে, সে আমাকে দেখিতে পাইতেছে না ভগ্নদেউলের অন্ধকারে।

বিকট ফোঁস ফোঁস শব্দে অন্ধকার যেন আমার দিকে দাঁত খিচাইতেছে, কোথায় আছে কালসর্প আমার অতি কাছে, এই ঘন আঁধারের মধ্যে সে আমার জীবনলীলার অবসান

বুঝি করিয়া দিল! উচ্চরবে আর্তকণ্ঠে ডাকিলাম–মনু! মনু! সাপ! সাপ! শিগগির এসো–

আমার ডান পায়ের পাশেই আবার সেই ফোঁস ফোঁস শব্দ এবং সঙ্গেসঙ্গে আমার গায়ে কে যেন শক্ত লাঠির ঘা বসাইয়া দিল। আবার ফোঁস ফোঁস শব্দ।

মনু আসিয়া বলিল– কী? কী?

খেয়ে ফেললে, বড়ো সাপ!

সরে এসো। এক লাফে ওই ইটের ওপর উঠে যাও।

সঙ্গে সঙ্গে আমার ডান পায়ে আর একটা লাঠির বাড়ি এবং ঝাঁটার কাঠি ফোঁটানোর মতো বেদনা। একটা মস্ত ইট কী পাথর ছোঁড়ার শব্দ শুনিলাম। মনু বোধ হয় কালসর্পের দিকে ছুড়িয়া মারিল। আমার কাছে ছুটিয়া আসিয়া বলিল–কামড়েছে?

হুঁ।

কোথায়? চলো তাড়াতাড়ি বাইরে! এক-শো বার বারণ করলাম, ওর মধ্যে ঢুকো না। আমার সব কথা তোমার টক লাগে!

এখন ভাই কথা বোলো না বেশি। চলো বাইরে যাচ্ছি।

আমি ধরে নিয়ে যাই।

কিছু না, আমি নিজে যেতে পারব।

দুইটা ছোটো ছিদ্র দেখা গেল গোড়ালির কাছে। মনু আমার কোমরের কাপড় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তিনটি শক্ত বাঁধন দিল। তারপর আমার হাত ধরিয়া ডিঙিতে উঠাইয়া অতি দ্রুত ডিঙি বাইতে লাগিল–কিন্তু উলটো দিকে, যেদিকে বাড়ি সেদিকে নয়। আমি ভুল দেখিতেছি না তো?

বলিলাম–ভাই মনু—

চুপ–

আমার শেষ হয়ে এসেছে—

আবার!

মার সঙ্গে ভাই দেখা হল না–

আঃ—

–তুই আমার বড়ো বন্ধু ছিলি—

–আবার বকে! চুপ!

আমার মনে হইল আমরা উলটো দিকে চলিয়াছি। আগেই মনে হইয়াছিল–বলিয়াছি। ও কোথায় চলিয়াছে পাগলের মতো এ অন্ধকারের মধ্যে দিয়া?

একটা জায়গায় ডিঙি রাখিয়া সে আমাকে নামাইয়া লইল। জঙ্গলের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় গোলপাতায় ছাওয়া একখানা কুটির। কুটিরের সামনে গিয়া সে ডাকিল–ওস্তাদজি, ওস্তাদজি—

ঘর হইতে বাহির হইয়া আমাদের সামনে যে আসিল তাহাকে দেখিয়া হাসিব কি কাঁদিব বুঝিতে পারিলাম না। লোকটা কি যাত্রাদলের নারদ? কারণ সেইরকমই সাদা লম্বা দাড়ি, তাহার বয়স যে কত তাহা আমার বুঝিবার কথা নয়। তবে সে যে অতি বৃদ্ধ, এ বিষয়ে কোনো ভুল নাই।

বৃদ্ধ আসিয়া অন্ধকারের মধ্যে আমাদের দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল। থতমতো খাইয়া বলিল–কে বাবা তোমরা?

মনু বলিল–আমি। ভালো করে চেয়ে দেখো। আমার এই ভাইকে জাতসাপে কামড়েছে। সময় নেই–একে বাঁচাও।

ওস্তাদ তখনি আমার কাছে আসিয়া বলিল–দেখি দেখি, কোথায়?

এই যে, দাঁতের দাগ দেখো।

ঠিক।

বাঁচবে?

তেনার হাত, আমি কী জানি? যা বলি তা করো।

বলো।

একে আরও বাঁধন দিতে হবে; দড়ি দিচ্ছি।

আমাকে ইহারা দুজনে মিলিয়া কী কসিয়াই বাঁধিল! এ যন্ত্রণার চেয়ে মৃত্যু বোধ হয় ভালো ছিল।

হঠাৎ কানে গেল মনু বলিতেছে–ঘুমিও না ভাই–এই, ঘুমিও না—

ঘুমাইতেছি? কে বলিল?

কিন্তু পরক্ষণেই আমার মনে হইল দেশের বাড়ির দাওয়ায় আমি বসিয়া আছি। মা একবার আসিয়া বলিলেন–কী হয়েছে নীলু, বাবা আমার, কোথায় কী হয়েছে দেখি?

মা আমায় গায়ে তাঁহার পদ্মহস্ত বুলাইয়া দিলেন। তারপর একথালা গরম ভাত ও মাগুরমাছের ঝোল আনিয়া আমায় খাওয়াইতে বসিলেন।

আমি বলিলাম–মা তোমাকে কত দিন দেখিনি—

মা হাসিলেন, কী প্রসন্ন হাসি!

বলিলাম–ওরা ধরে রেখেছিল, তোমার কাছে আসতে দিচ্ছিল না। এই সময়ে আরও অনেক লোক আসিল আমাদের পাড়ার। বিলু পিসি, কার্তিক, সুনু, বৃন্দাবনদা। উহারা আমায় দেখিয়া বড়ো খুশি। সকলেই বলিল–ওমা, আমাদের নীলু যে আবার ফিরে এসেছে! ও নীলু? নীলু?

আমি তন্দ্রা থেকে জাগিয়া উঠিলাম যেন। না, কেহ কোথাও নাই। মনু আমার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানিতেছে আর বৃদ্ধ ওঝা আমার পায়ের উপর ছপাৎ ছপাৎ বেতের বাড়ি মারিতেছে।

মনু উহাকে জিজ্ঞাসা করিল–কীরকম বুঝছ ওস্তাদজি।

ওস্তাদ বৃদ্ধ বলিল–আশা আছে। ঘুমিয়ে না পড়ে আবার! ঘুমোলে চলবে না–ঘুমের মধ্যেই মরে যাবে। আমাকে ডাকিয়া বলিল–জলতেষ্টা পাচ্ছে?

–হুঁ।

–মনু, ওকে গরমজলটা খাইয়ে দাও এবার।

www.bengaliebook.com

–তুমি ততক্ষণ মারো বেত। এই দেখো ঢুলছে—

দু-জনে মিলিয়া কী মার আমায় মারিল আর কী পরিশ্রমটাই করিল। ছেলের জন্যে বাবা যেমন কষ্ট ও চেষ্টা করে, বৃদ্ধ ওঝা তাহার চেয়ে একটুও কম কষ্ট আমার জন্যে করেনি।

মনু বলিল–ওস্তাদজি, এবার কী মনে হয়?

হয়ে গেল।

শেষ হয়ে গেল?

আমাদের কাজ শেষ হল।

বেঁচে গেল তো?

আলবৎ। নইলে আর ওঝাগিরি করব না।

বেলা হইল। গাছের মাথায় প্রাতঃসূর্যের রোদ পড়িয়াছে। বসন্তবৌরি পাখির ডাক শোনা যায় বনের মধ্যে। অনেকক্ষণ আগে বাঁধনগুলি কাটা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার পা অবশ, কসিয়া বাঁধন দেওয়ার ফলে আমার পা আড়ষ্ট–হাঁটিবার উপায় নাই।

ওস্তাদ খাইতে দিল আমাকে। একটা পাতায় গরমভাত ও গরম ফ্যান, জংলি গোঁড়া লেবু একটা আস্ত আর নুন। কোনো উপকরণের বাহুল্য নাই। সেই ভাত আর লেবুর রস সোনা হেন মুখ করিয়া খাইলাম। ডিঙিতে উঠিবার সময় ওস্তাদ বৃদ্ধকে নমস্কার করিয়া বলিলাম–আবার আসব।

অবশ্য আসবে, বাবা।

তুমি খুব বাঁচা বাঁচিয়েছ আজ।

তেনার হাত, তিনি বাঁচিয়েছেন।

ডিঙি বাহিয়া যাইতে যাইতে কেবলই মনে হইতেছিল, এ আমার জীবনের এক নতুন প্রভাত। মানুষের মধ্যে যে ভগবান বাস করেন, তাহা আজ বুঝিয়াছি। নতুবা মনু আমার কে? কেন সে এত প্রাণের টান দেখাইল আমাকে বাঁচাইতে? বৃদ্ধ ওঝা আমার কে? কেন সে সারারাত্রি জাগিল আমায় জীবন দিতে? মনুকে আজ নতুন চোখে

www.bengaliebook.com

দেখিতেছি। ও আমার ভাই। উহাদের কাছে সারাজীবন থাকিতে পারি। মা না থাকিলে নিশ্চয় থাকিতাম।

মনু বলিল–ভালো মনে হচ্ছে!

হুঁ।

বলছিলে যে শেষ হয়ে গেল।

তুমি না থাকলে তাই হত। তুমি আমার ভাই।

থাক। কাল না কত কথা বলছিলে, মনে নেই?

সেসব ভুলে যা মনু। দুই-ভাইয়ের মতো থাকব এখন থেকে।

একটা কথা।

কী?

বাড়ি গিয়ে এসব কথা কিন্তু বলতে পারবে না মাকে বা বাবাকে। কেমন?

তুমি যা বলবে ভাই। বললাম তো, তুমি আমার ভাই আজ থেকে।

মনু কথার উত্তর না দিয়া একটুমাত্র হাসিল।

ইতিমধ্যে শীতকাল পড়িল। জঙ্গলের মধ্যে বর্ষার কাদা অনেকটা শুকাইয়া আসিল। পাশের নদীর দুইধারের ঝোপে পেতনিপোতার সাদা ফুল পেঁজাতুলার রাশির মতো শোভা পাইতে লাগিল। এই সময় মনুর বাবা দেখি বজরা সাজাইয়া অস্ত্রশস্ত্র লইয়া রোজই কোথায় বাহির হইয়া যায়। অনেক রাত্রিতে ফেরে। আমাদের ঘরে অনেক কাপড়চোপড়, খাবার জিনিস আর ধরে না।

একদিন মনুকে বলিলাম কথাটা।

মনু বলিল–ভাই, আমাকেও তো বড়ো হলে ওই করতে হবে। বাবাকে বারণ করব কেন?

তুমি আমার ভাইয়ের মতো। তোমাকে আমি ভালো পথে নিয়ে যেতে চাই।

তা হবে না। বাবা যা বলেন তাই হবে, তবে একটা কথা।

কী?

বাবা বলছিলেন, ক্রমে পুলিশের ভয় বাড়ছে। এ কাজ আর চলবে না?

তবে?

কী করি বলো তুমি।

আমি পথ বলে দিতে পারি। সে-কথা কি তোমার বাবা শুনবেন? লেখাপড়া শেখো। কানাইডাঙায় ডাক্তারবাবু স্কুল খুলেছেন। সেখানে ভরতি হও। কী করে খাবে দেখতে হবে তো?

তুমি বাবাকে বোলো। নিবারণ আমাদের লইয়া মাছ ধরিতে চলিত রোজই দুপুরের পর। এদিনও আসিল। বলিল –একটা জিনিস তোমাকে দেখাব। ফাঁদে বাঘ পড়ে না, বলেছিলে না?

বলিলাম–পড়েছে নাকি?

চলো দেখবে।

দূর হইতে দেখিলাম চার-পাঁচখানা ডিঙি পশোর নদীর দিকে চলিয়াছে। আমাদের ডিঙিও সেগুলির পিছনে পিছনে চলিল। নিবারণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, উহারা মাছ ধরিতে চলিয়াছে।

কিন্তু সেদিন অমন বিপদে পড়িতে হইবে জানিলে বোধ হয় নিবারণের সঙ্গে যাইতাম না।

পশোর নদীর মধ্যে গিয়া দেখি সেখানে আরও অনেক জেলেডিঙি। ইহারা ডাঙায় নামিয়া রান্না করিয়া খাইতেছিল। আমরা জাল ফেলিতেই মস্ত বড়ো একটা দয়ে-ভাঙন জালে আটকাইল। মাছটার ওজন আধ মণের উপর। দয়ে-ভাঙন সামুদ্রিক মাছ, এতদিন ইহাদের মধ্যে থাকিবার ফলে আমি এই মাছ চিনিয়াছিলাম। খাইতে খুব সুস্বাদু। অন্য সামুদ্রিক মাছ আমার মুখে রুচিত না, কেবল এই মাছ ছাড়া।

মাছটা ডিঙিতে তুলিতে গিয়া ডিঙি কাত হইয়া গেল।

কীভাবে পা পিছলাইয়া আমি জলে পড়িয়া গেলাম, সঙ্গেসঙ্গে সেই মস্ত মাছটা আমার দিকে তাড়া করিয়া আসিল; দয়ে-ভাঙন মাছ মানুষকে তাড়া করে কখনো শুনি নাই; চিৎকার করিতেই নিবারণ দাঁড় তুলিয়া মাছটার গায়ে এক ঘা মারিল। সেটা একবার ঝাঁপটা মারিতেই জালের দড়ি ছিঁড়িয়া গেল। মাছ আসিয়া আমার হাঁটু কামড়াইয়া ধরিল। আমি ডিঙির কানা ধরিতে চেষ্টা করিলাম, নাগাল পাইলাম না। মাছটার টান এবং ভাটার টানে মিলিয়া আমাকে ডিঙি হইতে দূরে লইয়া ফেলিল। একবার এক ঝলক লোনা-জলের খাবি খাইয়া বুঝিলাম মাছ আমাকে জলের তলায় লইবার চেষ্টা করিতেছে।

সেই সময় নিবারণ চিৎকার করিয়া অন্য ডিঙির লোকেদের ডাক দিল। একজন দূর হইতে এই ব্যাপার দেখিয়া এই দিকে ডিঙি বাহিয়া দ্রুত আসিতেছিল।

এসব এক মিনিটের মধ্যে ঘটিয়া গেল। পরের মিনিটে মনে হইল, আমি একটা অন্ধকার অতলস্পর্শ গুহার দিকে চলিয়াছি। গুহাটা ক্রমশ বড়ো হইতেছে, ক্রমশ আমাকে গিলিয়া খাইতে আসিতেছে।

অনেক লোক মিলিয়া কোথায় যেন চিৎকার করিতেছে শুনিলাম। তারপর আমি নিজের চেষ্টায় গুহা হইতে জোর করিয়া মাথা উঠাইয়া আবার দেখি সামনে বিস্তৃত পো‌ের নদী, ওপারের সবুজ গোলগাছ ও হেঁতালঝোঁপের সারি। অস্পষ্ট দেখাইতেছে দূরের তটরেখা। নদীর বুকে রৌদ্র চিকচিক করিতেছে।

কে একজন বলিয়া উঠিল কানে গেল–বেঁচে আছে! বেঁচে আছে।

আমি আশ্চর্য হইয়া ভাবিলাম– কে বাঁচিয়া আছে, কাহার কথা বলিতেছে ডিঙির লোকেরা?

অমনি আবার বুঝিলাম মাছটা আমাকে একটা প্রবল ডানার ঝাঁপটা মারিয়া অবশ করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল। আমার হাঁটু তখন মুক্ত, যে কারণে হউক, মাছটা আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। এবার কামড়াইবার পূর্বেই আমাকে ডিঙিতে উঠিতেই হইবে। জলের জানোয়ার জলে বাঘের মতো শক্তি ধরে। আমি সেখানে অসহায়। এবার আমাকে ডুবাইয়া মারিবে।

আমি সাঁতার দিয়া ডিঙির দিকে আসিবার চেষ্টা করিতেই আর একটা ভীষণ ডানার ঝাঁপটা খাইলাম। এবারের ঝাঁপটায় আমার সারাদেহ যেন অবশ হইয়া গেল। আমি দুই-পা জলের উপর ভাসাইয়া জল ঠেলিয়া ডিঙির কাছে আসিতে চেষ্টা করিলাম।

অনেকগুলি হাত একসঙ্গে আমাকে টানিয়া ডিঙির উপর তুলিয়া লইল।ডিঙির উপর উঠিতেই আমি হাঁটুর নীচে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করিলাম। এতক্ষণ যন্ত্রণা বুঝিতে পারি নাই। হাঁটুর নীচে চাহিয়া দেখি, রক্তে সে জায়গাটা লাল হইয়া গিয়াছে।

নিবারণ বলিল–এঃ, কী কামড় দিয়েছে দেখো!

যন্ত্রণায় আমি মাঝে মাঝে অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছিলাম–মাঝে মাঝে জ্ঞান হইতেছিল। অনেকে কী সব শিকড়-বাকড়ের রস মাখাইতে লাগিল, বাঁধাবাঁধি করিল। যখন ভালো জ্ঞান হইল, তখন দেখি মনু আমার শিয়রে। আনন্দে উহার হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম–ভাই মনু, আমি কোথায়?

চুপ করো। তুমি বাড়িতে।

কী করে এলাম?

কাল রাতে দিয়ে গিয়েছে।

সে কী কথা! কাল রাত্রির কথার মানে বুঝিলাম না। দুপুরে আমাকে মাছে কামড়াইয়াছিল জানি। এতক্ষণ আমার জ্ঞান ছিল না–

বলিলাম–এখন বেলা কত?

বিকেল হয়েছে।

মাছটা মারা হয়েছে?

কোন মাছ?

যে মাছ আমাকে কামড়েছিল?

তোমাকে মাছ কামড়ায়নি।

কে কামড়ে ছিল?

হাঙরে।

সে কী? আমি যে দেখলাম দয়ে-ভাঙন মাছ জালে পড়ল—

সেটা দয়ে-ভাঙন নয়, সেটা মস্ত ভীষণ মানুষ-খেকো হাঙর।

আমায় সারাদেহ শিহরিয়া উঠিল, চৈতন্য আবার লোপ পাইবার উপক্রম হইল। হাঙরের হাতে পড়িয়া কী করিয়া বাঁচিয়া ফিরিলাম? সর্বনাশ! বাঁচিয়া আছি তো?

ডাকিলাম–ও ভাই মনু—

কথা বোলো না!

হাঙর কী করে জানা গেল? কে বললে হাঙর?

সেটা মারা পড়েছে। কাল দেখো তার পেটে একটা মানুষের হাতের বালা পাওয়া গিয়েছে। হাঙর মিষ্টি জলেও যায়। কোনো গ্রামের কাউকে ধরেছিল–ছোটো মেয়ের হাতের বালা।

দেখি বালাটা?

না, এখন চুপ করে থাকো। কাল সব দেখাব।

পরদিন অনেকখানি সুস্থ হইয়া উঠিলাম। নিবারণ আসিয়া বলিল–বাঘ দেখেছ? ফাঁদে পড়েছিল যে–

কোথায় বাঘ?

তোমাকে যে বাঘ প্রায় শেষ করেছিল হে! জলের বাঘ!

তুমি কি আমাকে ওই বাঘ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলে?

, ডাঙার বাঘও দেখাবো। দাঁড়াও জলের বাঘ দেখাই।

নিবারণ সেই প্রকান্ড হাঙর আমার সামনে টানিয়া আনিল। তাহার বিকট দশনপাটি দেখিয়া বুঝিলাম কাল জলের মধ্যে আমার কী বিপদ গিয়াছে। এই ভীষণ বাঘের হাত হইতে নিতান্ত যে রক্ষা পাইয়াছি, তাহা ভগবানের দয়া।

মনু বলিল–এই দেখো সেই বালা। এর আসল দাঁত তুমি দেখোনি। চামড়ার খাপে ঢাকা থাকে, এই দেখো দেখাই।

ছোট্ট বালা দুইটি হাতে করিয়া কষ্ট হইল। কোন বালিকার প্রাণনাশ করিয়াছে এইহিংস্র নরখাদক জানোয়ারটা? দেখিতে অবিকল দয়ে-ভাঙন অথবা আড়মাছের মতো। কে জানে সেটা অত ভীষণ জানোয়ার! খাপে ঢাকা উহার ছেদনদন্তগুলি ক্ষুরের মতো তীক্ষ্ণ ও ভয়ানক।

পায়ের নীচের দিকে চাহিয়া দেখি অনেকটা পটি দেওয়া বাঁধা। এক মাস পরে জংলি লতাপাতার রস মাখাইতে মাখাইতে ঘা সারিয়া গেল। সকলে বলিল, পুনর্জন্ম! কারণ হাঙরের দাঁতের বিষে ঘা পচিয়া মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এদেশে প্রবাদ আছে–কুমিরে নিলে বরং বাঁচে, হাঙরের ঘায়ে সাবাড়!

রোগশয্যায় শুইয়া বড়ো দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি।

বাড়ি হইতে বেশিদূর কোথাও যাই না আজকাল। একটা কেওড়া গাছের ছায়ায় বসিয়া ছবি আঁকি মনে মনে, নয়তো মনুর সঙ্গে গল্প করি। বই পড়িতে ভালোবাসি–কিন্তু এখানে বাংলা বই কোথায়? দেশে আমার বাবার কত ভালো ভালো বই আছে–এখন মনে পড়িল। সেদিন বিকালে কেওড়াতলায় বসিয়া বড়ো মন খারাপ হইয়া গেল। যদি এযাত্রা মরিয়া যাইতাম তবে মার সঙ্গে দেখার আশাও চিরতরে লুপ্ত হইত। মা কী ভাবিতেছেন কী জানি? তিনি কি রোজ আমার কথা ভাবিয়া চোখের জল ফেলেন না? মনু পিছন হইতে আসিয়া চোখ টিপিয়া ধরিল।

ছেড়ে দাও হে, আমি জানি।

কী ভাবছ?

উহার দিকে চাহিয়া বলিলাম–জান না?

সে বলিল–জানব কী করে?

খুব জান!

বাড়ির কথা তো?

তবে? মার কথা!

মনু চুপ করিয়া গেল। আমার বড়ো দুঃখ হয়, আমার দুঃখের কথায়, কষ্টের কথায় ও সহানুভূতি দেখায় না কেন? মনু আমাকে বলিল–আমাকে লেখাপড়া শেখাবে? আমি বলিলাম–বাংলা না ইংরেজি? মগ-ভাষা তো জানি নে। কত গল্প হইত দু-জনে। সবই

ভালো। কিন্তু বাড়ির কথা বলিলে মনু চুপ হইয়া যায়। কিছুক্ষণ বসিয়া সে চলিয়া গেল। তারপরে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে। আমার পিছন হইতে কে আসিয়া আমার মাথায় হাত দিল। চমকিয়া পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম সেদিনকার বনবিবিতলার সেই মা! আমার হাতে একছড়া পাকা কলা ও চারিটি বড়ো মুড়ির মোয়া দিয়া বলিলেন– তোমার জন্যে এনেছি, খাও। সব শুনলাম নিবারণের কাছে, হাঙরে নাকি ধরেছিল তোমায়?

অবাক হইয়া মার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম–হুঁ।

কোথায় দেখি?

এই যে হাঁটুতে।

আহা হা, কী সর্বনাশ!

তিনি আমার পাশে বসিয়া অনেক ভালো ভালো কথা বলিলেন। আমাকে কলা ও মুড়ির সব মোয়াগুলি খাওয়াইলেন, আমার নিজের মা আজ এখানে থাকিলে এরকমই করিতেন। এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিলেন–তোমাকে বাড়ি পাঠাবার চেষ্টা করেছি অনেক, কিন্তু পেরে উঠছি না। এদের সবাই ভয় করে কিনা।

আমি বলিলাম–কী চেষ্টা করেছেন?

ডিঙি ভাড়া করে তোমাকে পাঠাবার চেষ্ট করেছি, কেউ যেতে চায় না।

দরকার নেই এখন। আপনার কোনো বিপদ হয় এ আমি চাই না।

কতদিন হল এনেছে তোমায়?

তিন বছর হয়ে গিয়েছে। তেরো বছর বয়সে এনেছিল, এখন আমার বয়েস ষোলো।

আহা-হা! কী করে আছেন তোমার মা? তোমার যেতে ইচ্ছে হয় তো?

অনেক সয়ে গিয়েছে মা। আপনাকেই মা বলে ডাকি।

তিনি হাসিয়া আমার মাথায় হাত দিয়া আদর করিলেন। আমার জন্যে আবার খাবার লইয়া আসিবেন বলিলেন। আমি কি খাইতে ভালোবাসি–মুড়ির মোয়া? মাছের তরকারি? উহারা মগ–মাছের তরকারি রান্নার কী জানে? তিনি ভালো ভাবে তরকারি রান্না করিয়া আমাকে খাওয়াইতে আসিবেন! মা চলিয়া গেলেন।

কতক্ষণ পর্যন্ত আমি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম সে-দিকে।

মনু একদিন আমায় বলিল–ভাই, তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে। চলো নিবারণ আসবার আগে আজ আমরা ডিঙি নিয়ে বার হই।

পশোর নদীর মধ্যে পড়িয়া আমরা ধীরে ধীরে অনেক দূরে গেলাম। জঙ্গলের মধ্যে সেখানে একস্থানে ডিঙি বাঁধিয়া মনু আমায় গভীর জঙ্গলের মধ্যে লইয়া গেল। তখন গ্রীষ্মের শেষ, বর্ষা দেখা দিয়েছে। নাবাল জমি ডুবিতে শুরু হইয়াছে। মৌমাছির উপদ্রবে জঙ্গলে হাঁটা নিরাপদ নয়, কারণ এ সময় মৌমাছির ঝাঁক গৃহহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। বেতের টক ফল খাইতে খাইতে আমরা কত দূর গেলাম।

সেখানে জঙ্গলের মধ্যে একটা গোলপাতার ঘর দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া মনুকে জিজ্ঞাসা করিতেই সে বলিল–এখানে এসো, বসা যাক। এ আমাদের ঘর। তোমাকে আর আমাকে আজ এখানে আসবার কথা বাবা বলে দিয়েছে।

কেন?

আজ আমাদের বোম্বেটের কাজে ভরতি হতে হবে।

সে কী কথা।

তাই। এটা জলের ডাকাতদের ঠাকুরঘর। এখানে দীক্ষা হয়।

দীক্ষা?

ডাকাতদের কাজে ভরতি হবার আগে এখানে পুজো দিতে হয়। অনেক কিছু করতে হয়। তোমাদের কথায় তাকে দীক্ষা বলে তো, সেদিন বইয়ে পড়লে যে!

মনুকে ইতিমধ্যে আমি বই পড়াইয়াছি খানকতক, বাংলা বেশ ভালো শিখাইয়াছি। বিদ্যার গুণে উহার মন যে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইতেছে, এ আমি বুঝিয়াছি। হাজার হউক, আমাদের বয়স বাড়িয়াছে, অনেক কিছু বুঝি, অনেক কিছু ভাবি। মনুর বাবা এ সমস্ত তত পছন্দ করেন না, তাও জানি। মনুর অনুরোধে তিনি খুলনা হইতে বাংলা বই মাঝে মাঝে আনিয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাকে বলেন, বেশি বই পড়িয়া কি বাঙালি বনিয়া যাইবি নাকি? অত বই পড়ার মধ্যে কী আছে?

মনুর কথা শুনিয়া প্রমাদ গনিলাম। আমাকেও কি ডাকাত হইতে হইবে নাকি?

মনু বলিল–আমার অনুরোধে তোমাকে বিক্রি করা হয়নি। তোমার আমার ভাব দেখে বাবা ঠিক করেছেন আমাদের একসঙ্গে রাখবেন। নইলে আরাকানে কিংবা রেঙ্গুনে তোমাকে বিক্রি করা হত।

বল কী!

তাই।

এখন কী করবে ভাবছ?

তুমি যা বলবে তাই করব। ওই জন্যেই একটু আগে এখানে তোমাকে নিয়ে এলাম।

বেশি কথা বলিবার সময় পাওয়া গেল না। মনুর বাবা ও আরও কয়েকজন লোক একখানা ছিপে আসিয়া পড়িল। এই দস্যুদের আমি দেখিতে পারি না। মনুর বাবার মধ্যে মানুষের হৃদয় নাই জানি, থাকিলে আমায় এভাবে বন্দি করিয়া রাখিতে পারেন কি?

মনুর বাবা বলিলেন–সব তৈরি হয়ে নাও। আজ তোমাদের ভরতি হবার দিন। নেয়ে এসো নদীর জলে। মুরগি বলি দিয়ে আমরা কাজ আরম্ভ করব।

আমি বলিলাম–কী কাজ?

বললাম যে, আমাদের দলে তোমাদের ভরতি করে নেব আজ!

মনুকে নিন। আমি ডাকাতি করব না।

তোমার কথায় হবে?

দেখুন আপনি আমার বাবার মতো। মিথ্যে কথা বলব না আপনার সঙ্গে। আমি ভদ্রবংশের ছেলে, এ কাজ আমার নয়। আমার বয়েস হল সতেরো বছর, সব বুঝি।

ওসব চলবে না।

মানুষ খুন আমার দ্বারা হবে না। লুঠপাটও হবে না।

তোমাকে বিক্রি করে দেব, জান? কেনা চাকর হয়ে চীন দেশে গিয়ে থাকতে হবে।

যা হয় করুন। ডাকাতি আমার দ্বারা হবে না।

মনু বলিল–বাবা, আমারও এই মত।

মনুর বাবা ভয়ানক রাগিয়া গেলেন। আমাকে বলিলেন–তোমার সঙ্গে মিশে মনুও উচ্ছন্নে গিয়েছে তা আমি সন্দেহ করেছি আগে থেকেই। আজ শুধু তোমাদের পরীক্ষা করবার জন্যেই এখানে এনেছি, তা জান? কী করতে চাও তোমরা? কী করে খাবে এর পরে?

আমি আকাশের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিলাম–ওঁর ওপর নির্ভর করুন। তিনি যা করেন। পরের জিনিস লুঠ করে খেতে তিনি নিশ্চয় বলবেন না। আপনারও বয়েস হয়েছে, ভেবে দেখুন।

মনুর বাবা একে রাগিয়া ছিলেন, এবার আমার মুখে ভগবানের কথা শুনিয়া তেলেবেগুনে জ্বলিয়া আমাকে লাঠি তুলিয়া মারিতে আসিলেন। মনু গিয়া তাঁহার হাতের লাঠি ধরিয়া ফেলিল। তাঁহার সঙ্গের লোকেরাও বাধা দিল। উহাদের মধ্যে একজন বলিল–এরা যা বলছে ভেবে দেখুন সর্দারজি। ডাকাতি করা চলবে না। দু-খানা পুলিশ লঞ্চ সর্বদা ঘুরছে শুধু এক পশোর নদীতে। ফরেস্ট বিভাগের লোকও আজকাল খুব সতর্ক।

মনু বলিল–বাবা, আপনারা যা করেছেন, তা করেছেন। কাল বদলাচ্ছে না? ভেবে দেখুন, আগে যা করেছেন, তা এখন আর করতে পারেন কি?

এই পর্যন্ত কথা হইয়াছে, এমন সময় জঙ্গলের ওধারে হুইসিল শোনা গেল এবং সঙ্গেসঙ্গে একবার বন্দুকের আওয়াজ হইল। আমরা জঙ্গলের দিকে ছুটিয়া যাইতেছি, এমন সময় জনাচারেক পুলিশের পোশাক পরা লোককে অদূরে দেখিতে পাইলাম। ইহারা সকলেই বাঙালি, দেখিয়াই মনে হইল।

একজন আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিল। চাহিয়া দেখিলাম, মনুর বাবার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। তিনি বেশ বুঝিয়াছেন, এবার আর কোনো উপায় নাই। পুলিশ কি তাঁহার সন্ধানে আসিল। পরক্ষণেই দেখা গেল তাহা নহে, পুলিশ ইহারা নয়, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোক। আমাদের বলিল– কে?

মনুর বাবা বলিলেন–যাত্রী।

কীসের?

পুজো দিতে এসেছি ঠাকুরের কাছে।

কীসের ঘর এ?

বনবিবির দরগাঘর।

তুমি তো দেখছি মগ, কী নাম, কী করো?

আমার নাম টুং পে নু। আমি মাছ-ধরা-জেলে, এরা সব আমার লোক।

কোথায় মাছ ধর?

পশোর নদীর মধ্যে আর খালে।

মাছ-ধরা পাশ আছে? দেখাও!

এখানে তো মাছ ধরতে আসিনি হুজুর। দরগাতলায় পুজো দিতে এসেছি।

খবরদার গাছ কাটবে না।

না না, সে কী কথা! গাছ কাটব কেন?

তাহাদের মধ্যে একজন আমার দিকে অনেকক্ষণ হইতে চাহিয়াছিল, আমার কাছে আসিয়া বলিল– এ কে?

মনুর বাবা বলিলেন–আমার এখানে কাজ করে।

এ তো দেখছি বাঙালি।

ওর কেউ নেই। অনেকদিন থেকে আমার কাছে আছে।

তোমার নাম কী ছোকরা?

আমার বুকের ভেতর ঢিপ ঢিপ করিতেছে। চাহিয়া দেখি উহাদের সকলের মুখ সাদা হইয়া গিয়াছে। এমনকী মনুরও। এই তো আমার অবসর, এই সময় কেন বলি না আমার আসল কথা? উহারা দু-জন বন্দুকধারী লোক। উহাদের কাছে ইহারা কী করিবে? আমার মুক্তির এই তো শুভক্ষণ উপস্থিত!

মনুর দিকে চাহিয়া দেখিলাম। তাহার চোখ-মুখে কাতর প্রার্থনার আকুতি। মনুর বাবার মুখও শুকাইয়া গিয়াছে। উদবিগ্ন দৃষ্টি আমার মুখের দিকে নিবদ্ধ। ভগবান এবার কি

সুবিচার করিয়াছেন, দয়া করিয়া কি শুভক্ষণ জুটাইয়া দিয়াছেন? একবার মুখের কথা খসাই না কেন?

কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলাম, ইহাও এক প্রকারের বিশ্বাসঘাতকতা। মনুকে ভাই বলিয়া ডাকি, তাহার বাবাকে এরূপ হীনভাবে ধরাইয়া দিলে আমার ভালো হইবে বটে কিন্তু উহাদের সর্বনাশ হইবে। মনু কোনো অপরাধ করে নাই, সে তখননিতান্ত বালক ছিল– বাবা যাহা করেন, সে কীভাবে তাহাতে বাধা দিতে পারিত?

এসব চিন্তাভাবনা চক্ষের নিমেষে মনের মধ্যে করিয়া ফেলিলাম। ভাবিবার সময় কই? বড়ো হইয়াছি, আগের চেয়ে অনেক কিছু বুঝি। পুলিশের লোকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, আমার নাম নীলমণি রায়। আমি এদের এখানে কাজ করি? অনেক দিন আছি।

পুলিশের লোক বলিল– তোমার কেউ নেই?

ঢোক গিলিয়া বলিলাম–না।

আচ্ছা যাও, গাছ যেন কাটা না পড়ে।

উহারা সবাই একযোগে চলিয়া গেল।

মনুর বাবা আমার কাছে আসিয়া আমার দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া কী দেখিল, তারপর আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল–সাবাশ ছেলে! বাহবা বাবা! মনু আমার হাত দু-খানা ব্যগ্রতার সহিত জড়াইয়া ধরিল। সঙ্গের দু-একজন লোক বলিল–ভালো বংশের ছেলে বটে, বাঃ।

মনুর বাবা আমার ও মনুর দিকে চাহিয়া বলিলেন– বোসো এখানে! আমি আজ বড়ো বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম। গিয়েছিলাম একটা কাঁচা কাজ করবার জন্যে। এমনকাঁচা কাজ জীবনে কখনো করিনি। জীবনটি আজ চলে যেত। এই ছোকরা আজ আমাদের সকলের প্রাণ বাঁচিয়েছে। যে আমার বন্দি, তাকে নিয়ে দিনমানে কখনো এক বার হইনি, আজ তা বার হয়েছিলাম। নীলু বড়ো ভালো ছেলে, তাই আজ আমরা সবাই বেঁচে গেলাম। চলো আজ বাড়ি যাই, আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন–কী খেতে চাও বলো? বড়ো মাছ না খাসির মাংস? যা ইচ্ছে বলো!

আমার মনের মধ্যে একটি অপূর্বভাব আসিয়াছে তখন। খাওয়া অতি তুচ্ছ তাহার কাছে।

বলিলাম–যা হয় খাওয়াবেন, সেটা বড়ো কথা নয়। কিন্তু আমার দু-একটি কথা শুনবেন কি দয়া করে? মনুকে ভাইয়ের মতো দেখি, এ মুখের কথা নয়, তা তো দেখলেন!

মনুর বাবা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন–না না, আগে বলো কী খাবে? বড়ো মাছ না খাসির মাংস?

খাসির মাংস।

বেশ, আমি এখুনি জোগাড় করে আনছি। তুমি আর মনু বাড়ি যাও। তোমাদের সঙ্গে কথা আছে।

আমাকে সন্ধ্যার পর মনুর বাবা তাঁহার কাছে ডাকিলেন। আমি কোনো কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। মনুর বাবা বলিলেন– দেখো, আজ তোমার কাজে বড়ো সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি আমাদের আজ পুলিশে না ধরিয়ে দিয়ে একটা অদ্ভুত কাজ করেছ। তুমি যা খেতে চাও–অর্থাৎ খাসির মাংস, কাল সকালে তোমাকে খাওয়াব—

আমি মাথা নীচু করে বললাম–আমাকে মুক্তি দিন–

–সে তো তুমি আজ নিজের ইচ্ছেতে নাওনি! তোমাকে ছেড়ে দিতাম আজই, কিন্তু মনু তোমাকে বড়ো ভালোবাসে, তাই ভেবে পিছিয়ে যাচ্ছি। ওর লেখাপড়া যদি একটু হয়, তবে এ কাজ বন্ধ করে দেব। পুলিশ বড়ো পেছনে লেগে আছে, এ কাজ আর চলবে না।

আমাকে এখন কী করতে বলেন?

তোমাকে আমি ছেড়েই দিলাম। যেখানে খুশি যেও, ইচ্ছে হয় আমাকে বোলো। যা খেতে চাও তোমাকে খাওয়াব, কিন্তু একেবারে চলে যেও না। তুমি আমার ছেলের মতো। তুমি চলে গেলে তো আমাদের বড়ো কষ্ট হবে। মনুকে তুমি মানুষ করে দাও।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। এ জীবন বেশ লাগিতেছিল। বদ্ধ জীবনের চেয়ে অনেক ভালো। দিনে দিনে এ জীবনকে আমি ভালোবাসিয়াছি। কেবল ভাবি, মা কেমন আছেন, কীভাবে আছেন! সেদিন বসিয়া অনেক কিছু ভাবিলাম। বাড়ি তো যাইবই, কিন্তু এ জীবনের সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইব–আর এখানে ফিরিতে পারিব না, আর এ জীবনে ফিরিতে পারিব না। তার চেয়ে আর কিছুদিন থাকিয়া যাই। মনুর উপর একটা মায়া পড়িয়াছে, হঠাৎ ছাড়িয়া গেলে সে তো কষ্ট পাইবে।

www.bengaliebook.com

মনুকে লইয়া বিকালে বাহির হইলাম। এক জায়গায় একটা গাছের গুঁড়ির মধ্যে কী পাখি

বাসা বাঁধিয়াছিল, মনু আমাকে দেখাইতে লইয়া গেল।

আমি বলিলাম–ওর মধ্যে হাত দিও না যেন, সাপ থাকে।

সে আর আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে না। মনে নেই সেই সাপের কথা!

মনে নেই আবার?

কথা শেষ হইতে-না-হইতে মস্ত বড়ো একটা গোখুরা সাপ গাছের খোড়লের ভিতর হইতে ফোঁস করিয়া উঠিল। মনু অমনি সাপটার গলা চাপিয়া ধরিল ডান হাতে। সাপটা তাহার হাতে পেঁচ দিয়া জড়াইতে লাগিল। সে এক ভয়ানক দৃশ্য হইল দেখিতে। আমি তাড়াতাড়ি হাতের দা দিয়া সাপটাকে খানিকটা কাটিয়া ফেলিলাম–তাহাতে সে এমন জোর করিতে লাগিল যে মনু তাহার মুখ আর চাপিয়া রাখিতে পারে না। মনুর হাতের উপর আমিও জোর করিয়া চাপিয়া ধরিলাম। ইতিমধ্যে বিপদের উপর বিপদ– কোথা হইতে আর একটা সাপ দেখি আমাদের দুজনের মাথার উপর দুলিতেছে। ডালে তাহার ল্যাজ আটকানো। আমি চিৎকার করিয়া উঠিলাম। কিন্তু সাপটা আমার কাছেও আসিল না, ক্রমে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল এবং থুতুর মতো জিনিস আমাদের দিকে জোরে ফেলিতে লাগিল।

মনু বলিল–সাবধান! চোখ ঢাকো–চোখ ঢাকো–চোখ অন্ধ হয়ে যাবে—

আমি চোখ ঢাকিলে মনু মারা পড়ে, মনুও চোখ ঢাকিতে পারে না। চোখ অন্য দিকে ফিরাইয়া যতদূর সম্ভব চোখ বাঁচাইতেছি–মনুকে বলিলাম–খুব সাবধান, চোখ সাবধান–

সাপের থুতু লাগিতেছে আমার ঘাড়ে, মাথার চুলে, কানের পাশে। চোখ ভয়ে চাহিতে পারিতেছি না, মনুরও নিশ্চয় সেই অবস্থা। মিনিট দশ বারো এই অবস্থায় কাটিল, সাপের থুতু-বৃষ্টি আর থামে না। চাহিয়া দেখিতে ভরসা পাইতেছি না, সাপটা আমাদের কাছে আসিতেছে না দূরে যাইতেছে।

আমাদেরও সেখান হইতে চলিয়া যাইবার কোনো উপায় নাই। সাপটা একটা কেয়াঝোঁপের মধ্যে–যে জায়গাটুকু ফাঁক, সেখানেই ওই সাপটা থুতু ছুড়িতেছে। কেয়াকাঁটার মধ্যে হাতে সাপ জড়ানো অবস্থাতেই শেষে সন্তর্পণে ঢুকিয়া গেলাম দু-জনে। হাত-পা কাঁটায় ছড়িয়া গিয়া রক্তপাত হইতে লাগিল। সেই কেয়াবনের মধ্যে দাঁড়াইয়া আমি সন্তর্পণে সাপটাকে প্যাঁচাইয়া কাটিয়া তিনটুকরা করিলাম–শোল

কিংবা ল্যাটা মাছের মতো। রক্তে মনুর কাপড় ভাসিয়া গেল। মরা সাপটাকে হাত হইতে খুলিয়া ফেলিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরি।

রাত্রে কিন্তু ভাত খাইয়া মনু আমাকে বলিল–আবার সেই গাছের খোড়লে যেতে হবে এখন!

আমি আশ্চর্য হইয়া বলিলাম– কেন?

আছে মজা।

কী শুনি না? একবার বিপদে পড়ে আশ মেটেনি?

তা নয়। আমি ওখানে বিনা কারণে তখন যাইনি।

কী কারণে বলো। সেবার তো প্রাণ যেতে বসেছিল।

ওখানে সাপের মণি আছে।

কী সাপ?

সে আমি কী জানি, চলো দেখাবো।

সত্যই সাপের মণি আছে। আমি কখনো শুনিনি। মনু আমাকে সে অন্ধকার-রাত্রে বনের মধ্যে কেয়াগাছের কাঁটার পাশে লইয়া গিয়া দাঁড় করাইল। দু-জনে তারপর সেই গাছটার ডালে উঠিয়া বসিলাম।

আমি বললাম–মণি কই? গাছে উঠলে কেন?

সাপ আমাদের গাছের তলা দিয়ে যাবে একটু পরে।

কী সাপ?

গোখুরা বা অজগর। নিজের চোখেই দেখো।

কিছুক্ষণ পরে ঘোর অন্ধকারে আমাদের গাছের নীচে একটা জোনাকির মতো কী জিনিস চলিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। স্নিগ্ধ স্থির আলো, জোনাকির মতো একবার জ্বলিয়া আবার নিবিয়া যায় না। মনু বলিল–দেখেছ?

অই নাকি?

অই তো! তোমার কী মনে হয়?

বুঝতে পারছি না।

জিনিসটা অনেকক্ষণ নড়িয়া বেড়াইল। তারপরে আমাদের গাছটার ঠিক নীচে আসিয়া স্থির হইয়া রহিল। কী জিনিস কিছুই বুঝিলাম না।

মনু বলিল– সেই সাপটা!

কোনটা?

যেটা থুতু ফেলেছিল?

তুমি কী করে জানলে?

আমি অনেক দিন থেকে দেখছি।

মনি কী করে নেবে?

এক তাল গোবর ওর ওপর চাপা দিতে হবে। একটু পরে মণি নাবিয়ে রেখে সাপটা পোকামাকড় খুঁজবে, সেই সময়।

কিন্তু সে-সুযোগ সাপটা আমাদের দিল না! খানিকটা এদিক-ওদিক নড়িয়া-চড়িয়া সেটা চলিয়া গেল। আমরা আবার পরদিন সন্ধ্যার পর সেখানে গেলাম। সেদিনও সাপ আসিল বটে কিন্তু মণি নামাইতে তাহাকে দেখিলাম না। সে-রাত্রে আর কিছু হইলনা, পরের রাত্রেও সেরকম গেল।

আরও দু-দিন কাটিল! মনু বল্লম লইয়া গিয়াছিল সেরাত্রে। বল্লম তুলিয়া মারিতে গেলে আমি উহার হাত ধরিয়া বারণ করিলাম। সাপের মণি আছে কিনা জানি না, কিন্তু শুনিয়াছি এভাবে মণি সংগ্রহ করিলে অমঙ্গল হয়। মনু ও আমি ফিরিয়া আসিলাম। দিনদশেক পরে মনু একটি মরা সাপ আমাকে দেখাইল। তাহার মাথার উপর একটা সাদা আঁশ। মনু বলল–এই দেখো মণি, কাল রাতে একা গিয়ে সাপটাকে মারি। আলো তখুনি নিবে গেল। বুড়ো সাপের মাথায় এইরকম আঁশ হয়, রাত্রে জ্বলে। একেই বলে সাপের মণি। সব সাপের হয় না, কোনো কোনো সাপ বুড়ো হয়ে গেলে এই আঁশ গজায়।

আমাদের ছোটো গ্রামটি থেকে কিছু দূরে একটা জায়গা আছে, তার নাম মগের ট্যাঁক। এখানে আমরা হরিণ মারিতে আসিয়াছি–নিবারণ, মনু ও আমি। আমি কখনো এখানে আসি নাই, হরিণ মারিব বলিয়াও আসি নাই, আমি আসিয়াছি এজন্য যে এখানে সমুদ্রের শোভা দেখিতে পাইব। মগের ট্যাঁক একেবারে সমুদ্রের ধারে। ঘোলা জলের সমুদ্র নয়, নীল ঊর্মিমুখর বিশাল সমুদ্র মগের ট্যাঁকের ঘন সবুজ দীর্ঘ তৃণভূমির একেবারে নীচে। অনেক সময় জোয়ারের জল তৃণভূমি ছুঁইয়া থাকে।

একটা বড়ো কেওড়া গাছে উঠিয়া আমরা সকলে বসিয়া আছি। সামনে হাত-পঞ্চাশ দূরে অকূল সমুদ্র! গাছের উপর হইতে কী অদ্ভুত সে-দৃশ্য! বড়ো বড়ো ঢেউয়ের দল আছাড় খাইয়া পড়িতেছে মগের ট্যাঁকের নীচের বেলাভূমিতে। সাদা সাদা ফেনার ফুল ঢেউয়ের মাথায়।

মনু বলিল– কেমন মাছ ধরবার জায়গা!

তার চেয়েও ভালো এর চমৎকার দৃশ্য!

সে তো সব জায়গায় আছে। এমন মাছের জায়গা কিন্তু কোথাও নেই। আরাকান থেকে মগ জেলেরা এসে এখানে আগে আগে মাছ ধরত। তাই এর নাম মগের ট্যাঁক। গোলপাতার ঘর বানিয়ে এখানে দু-তিন মাস বাস করত। মাছও যা ধরত–

ভুল করছ মনু-চমৎকার দৃশ্য সব জায়গায় নেই। এদিকে চেয়ে দেখো–এমনআকাশ, এমন নীল রং–

আমি তো কিছু দেখতে পাই না—

খুব দেখতে পাও। দেখার চেষ্টা করলে দেখতে পাবে–দেখতে শেখো।

এমন সময় আর একটি নতুন দৃশ্য আমাদের চোখে পড়িল। একপাল হরিণ অদূরের জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া তৃণক্ষেত্রের মধ্যে সঁড়িপথ দিয়া এদিকেই আসিতেছে। সরু পথ সুতরাং হরিণগুলো একটির পিছনে আর একটি–দীর্ঘ সারি একটি। পথও আঁকাবাঁকা, হরিণের দীর্ঘ সারির গতিও আঁকাবাঁকা। সবসুদ্ধ মিলিয়া একটি ছবি। মনু আমার দিকে চাহিল। তাহার হাতে বন্দুক। আমি ইশারায় বারণ করিলাম। এমনসুন্দর মনোরম হরিণের সারি কি বন্দুকের গুলির নিষ্ঠুর আঘাতে ভাঙিয়া দেওয়া যায়? সেটা মানুষের কাজ কি?

মনু না বুঝিয়া আমায় চুপি চুপি বলিল–তুমি গুলি করবে?

না।

তবে আমি মারি?

না, চুপ করে থাকো। শুধু দেখে যাও।

মনু আগের মতো আর নাই; নতুবা আমার কথা শুনিত না। সে মগ ডাকাতের ছেলে, বোঝে লুঠপাট, রক্তপাত। আমার সঙ্গে মিশিয়া সে বুঝিতেছে, নিষ্ঠুর রক্তপাতই জীবনের শেষ কথা নয়। দয়া বলিয়া জিনিস আছে, সৌন্দর্য বলিয়া জিনিস আছে। সবটা বুঝিতে পারে না, তবুও বুঝিতে চেষ্টা করে। হরিণের দল সমুদ্রের ধারে গিয়া দাঁড়াইল–মগের ট্যাঁকে নির্জন তটে, তট যেখানে সমুদ্রে ঢুকিয়াছে। সম্মুখে নীল সমুদ্র, তাহার তটে নির্জন তৃণভূমিতে বিচরণরত একদল হরিণ–ইহার মতো সুন্দর ছবি জীবনে দেখি নাই। বন্দুকের বেখাপ্পা আওয়াজ করিয়া সে-ছবি নষ্ট করিতে দিব না।

নিবারণ শিস দিল। শিসের শব্দে হরিণগুলি চমকিয়া এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিল।

নিবারণ বলিল–মারো, মারো, এইবার মারো–

মনু বলিল–অঃ, সব পালাল!

আমি বলিলাম–এমন ছবিটা ভেঙে দিলে নিবারণ?

নিবারণ গাছ হইতে লাফাইয়া হরিণের দলের পিছু পিছু ছুটিল। হরিণেরা প্রাণের ভয়ে তৃণভূমিতে ইতস্তত বিশৃঙ্খলভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই-বা কী সুন্দর ছবি। সবগুলি ঢুকিয়া পড়িল বনের মধ্যে এবং অদৃশ্য হইয়া গেল চক্ষের পলকে। নিবারণ উহাদের সঙ্গে বনের মধ্যে ঢুকিল।

মনু বলিল–ও কী দিয়ে হরিণ মারবে?

কী জানি!

আমরা সেই তৃণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া সমুদ্র দেখিতেছি; মিনিট দশেক কাটিয়া গিয়াছে, এমন সময়ে জঙ্গলের মধ্যে নিবারণের আর্ত চিৎকার শুনিয়া দু-জনেই জঙ্গলের দিকে ছুটিলাম। আমায় মনে হইল গাছের উপর হইতে স্বরটি আসিয়াছে। মনুকে সাবধান করিয়া দিলাম– অজানা জঙ্গলে এভাবে না ছুটিয়া পথ দেখিয়া চলো। খানিকটা গিয়া দেখি নিবারণ একটা কেওড়া গাছের উপর বসিয়া পরিত্রাহি চিৎকার

করিতেছে। কেন সে চিৎকার করিতেছে কিছু বুঝিলাম না। মনুকে আবার সাবধান করিয়া দিলাম।

মনু বলিল–কী নিবারণ?

নিবারণ হাত নাড়িয়া বলিল–এসো না, এসো না হোদো গাছের তলায় বাঘ–হরিণের দল তাড়া করেছিল। আমার গাছের তলায় বাঘ দাঁড়িয়ে আছে, তোমরা উঠে পড়ো।

উহার গাছের তলায় বড়ো বড়ো হোদো গাছের জঙ্গল। হোদো জঙ্গলে বাঘ লুকাইয়া থাকিলে বাহির হইতে বোঝা যায় না। হোদো কাছের পাতা বিদ্যাপাতার মতো, তবে চার হাত পর্যন্ত লম্বা হয়। এগুলিকে ইংরেজিতে টাইগার ফার্ন বলে, তাহা পরে জানিয়াছিলাম। মনু আমার হাত ধরিয়া নিকটের গাছে উঠিতে যাইবে, এমন সময় হোদো জঙ্গল দুলাইয়া বাঘ নিঃশব্দে এক লাফ দিয়া, মনু পূর্বে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেখানে আসিয়া পড়িল। অর্থাৎ মনু আমাকে লইয়া না সরিলে সেই ভীষণ বাঘটা অব্যর্থ লক্ষ্যে তাহাকে ও আমাকে পিষিয়া দিত। বাঘে খাওয়া কিংবা আঁচড়ানো কামড়ানো পরের কথা–সাত-আট মণ ওজনের একটা বাঘের তীব্র লাফের পূর্ণ ঝাঁপটেই তো আমাদের প্রাণ বাহির হইয়া যাইতে পারে!

মনু সঙ্গেসঙ্গে বন্দুক তুলিয়া গুলি করিল। গুলি খাইয়া বাঘ আর একটা লাফ মারিল। যেখানে আমরা দাঁড়াইয়াছিলাম। মনু গুলি করিয়া বাঁ-দিকে লাফ দিয়া সরিয়া গিয়াছে। বাঘ এবার আর এক লাফ মারিল কিন্তু আমাদের দিকে নয়–সেই টাইগার ফার্নের জঙ্গলের মধ্যে।

ততক্ষণ আমি আর মনু গাছের উপর ঠেলিয়া উঠিয়াছি।

নিবারণ বলিল–ভাই, আমাকে বাঁচাও।

আমরা বলিলাম–কেন, তুমিও তো গাছের ওপর—

আমার হাতে কী আছে, আমি নামব কেমন করে? ও যদি লাফ দিয়ে গাছে ওঠে।

কিছু ভয় নেই। চুপ করে থাকো। আহত বাঘ বড়ো ভয়ানক জানোয়ার।

সেই অবস্থায় রাত্রি নামিয়া আসিল। ভয়ে আমরা কেহ গাছ হইতে নামিতে সাহস করিলাম না। আহত বাঘটা হয়তো ওঁত পাতিয়া আছে টাইগার ফার্নের জঙ্গলে, কে জানে? নামিলেই লাফ দিয়া ঘাড়ের উপর পড়িবে। আকাশে নক্ষত্র উঠিল। সমুদ্রের

তীর হইতে হাওয়া বহিতে লাগিল। সমুদ্রে ঢেউয়ে আলো জ্বলে, রাশি রাশি জোনাকি জ্বলে প্রত্যেক ঢেউয়ের উলটোনো পালটানোর খাঁজে খাঁজে। বাঃ রে!

মনু চেঁচাইয়া বলিল–নিবারণ! ঘুমিয়ে পড়ো না। পড়ে যাবে একেবারে, বাঘের মুখে—

নিবারণ বলিল–খিদে পেয়েছে, পেট জ্বলছে খিদেতে।

চুপ করে থাকো।

আমি বলিলাম–নক্ষত্র দেখো। মনু ও আমি দু-জনেই হাসিয়া উঠি।

৩. শিশির-ভেজা

সকাল হইলে আমরা গাছ হইতে নামিয়া, শিশির-ভেজা তৃণক্ষেত্রের মধ্য দিয়া সমুদ্রতীরে আসিলাম, সেখানে বসিয়া বসিয়া সমুদ্রের শোভা দেখিলাম। পরে ডিঙিতে চড়িয়া বাড়ি ফিরি। আসিবার সময় নিবারণকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সেই জিজ্ঞাসাটা আমার জীবনে একটা মস্ত বড়ো কাজ করিল। এখনও তাহা ভাবি। নিবারণকে বলিলাম–নিবারণ, আমাদের বাড়ি থেকে মগের ট্যাঁক কতদূর?

নিবারণ বলিল–কোশ খানেক।

আমি উহাকে কিছু বলি নাই, কিন্তু মনে ভাবি, এক ক্রোশ তো দূর, তবে মাঝে মাঝে একাই আসিব। সমুদ্রের এমন দৃশ্য–কোথায় পাইব এমন রূপ!

মনুর বাবা আজকাল আমার উপর খুব সন্তুষ্ট। কোথাও যাইতে-আসিতে আমার আর কোনো বাধা নাই। সেদিন ইহারা আমার মেজাজ বুঝিয়া লইয়াছেন। আমার সঙ্গে অনেক পরামর্শ করিয়াছেন, পুলিশের ভয় ক্রমেই বাড়িতেছে, সেদিন আর নাই। মনুকে লেখাপড়া শিখাইয়া আরাকানে সেগুন কাঠের ব্যাবসা করিয়া দিলে কেমন হয়। আমরা দুই ভাই সেই ব্যাবসা চালাইতে পারিব না? আমি বলিয়াছি–আমাকে ছাড়িয়া দিন, দেশের ছেলে দেশে ফিরিয়া যাই। মনুর বাবা না-ও বলেন না, হাঁ-ও বলেন না।

কিন্তু ও বিষয়ে পাকাপাকি স্থির করিল নিয়তি। তাহাই বলিতেছি। আমার সেদিনের উদারতার পুরস্কারস্বরূপ নিয়তি আমাকে হাত ধরিয়া চালাইল।

শরৎকাল তখন শেষ হইয়া আসিতেছিল। এই সময় মগের ট্যাঁকে তৃণভূমি জাগিয়া উঠে। নতুন তৃণভূমিতে হরিণের দল আসে। তাহা ছাড়া আছে সেই নীলসমুদ্রের মুক্তরূপ! একবার দুইবারে দেখায় সাধ কি মিটে!

একটি ডিঙি বাহিয়া চলিলাম–দুপুরের পর। আমি একা কখনো এ পথে আসি নাই। একটা খাঁড়ির মধ্যে ডিঙি ঢুকাইয়া ভাবিলাম সামনের খাল দিয়া বাহির হইব। অমন অনেক খাঁড়ি এদিক-ওদিকে গোলপাতার ও গরান জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে। মন অন্যমনস্ক ছিল, হঠাৎ মনে হইল এ কোথায় আসিলাম? আমার বাঁ-পাশে অগণিত হেঁতালঝোঁপ ও টাইগার ফার্নের জঙ্গল। হেঁতাল গাছ দেখিতে সরু খেজুর গাছের মতো, অমনি কাঁটাওয়ালা ঝাঁকড়ামাথা গাছ। তবে অত লম্বা বা মোটা হয় না। হেঁতাল ও টাইগার ফার্ন যেখানে থাকে, বাঘের ভয় সেখানে বেশি, তাহা জানিতাম। ডিঙি

ভিড়াইবার ভরসা হয় না এমন জনহীন পাড়ে। কোথা হইতে বাঘ আসিয়া ঘাড়ে পড়িবে ঠিক কী?

অনেক দূর বাহিয়া আসিয়া দেখি মস্ত বড়ো একটি নদীর মোহানার সামনে পড়িয়াছি। এটা কোন জায়গা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। যদি পশোর ও শিবসার মিলনস্থল হয়, তবে তো অনেকদূর আসিয়া পড়িলাম। মগের ট্যাঁকে যাইতে হইলে বাঁ-দিকের ডাঙার কূলে যাই না কেন? তবে নিশ্চয় বাহির-সমুদ্রের মুখে পড়িব। খানিকটা গিয়া দেখি, আর একটা বড়ো নদী আসিয়া মোহানাতে পড়িতেছে। এ আবার কোন নদী?

মাথা ঠিক রাখিতে পারিলাম না তারপর হইতে। পদে পদে বিচারে ভুল হইতে লাগিল। কোথা হইতে কোথায় যাইতেছি—কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না কেন? একটা লোকও কি কোথাও নাই? হঠাৎ দেখিলাম সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, ক্ষুধা পাইতেছে বিলক্ষণ। ফলের গাছের সন্ধানে চারিদিকে চাহিলাম। গোলগাছের ফল খাইতে ঠিক কচি তালের মতো, কিন্তু এ সময় একটাও চোখে পড়িল না। ভয় হইল, একা রাত্রে ডাঙায় নৌকা বাঁধিয়া থাকা নিরাপদ নয়, বাঘ ডিঙি হইতে আমাকে হালুম করিয়া একগাল মুড়ি-মুড়কির মতো মুখে করিয়া উধাও হইলেই মিটিয়া গেল!

অগত্যা নৌকা বাহিতে লাগিলাম। থামাইতে ভরসা হইল না। নদীরও কি শেষ নাই? রাত আন্দাজ চারিটার সময় অন্ধকারের মধ্যে দেখি আলো-জ্বলা-ঢেউ। আমার বৈঠার আলোড়নেও জলে জোনাকি জ্বলিতেছে। এইবার সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছি। আমার সামনে অকূল বাহির সমুদ্র। আর আগাইবার রাস্তা নাই। ডিঙি লইয়া সমুদ্রের মধ্যে গেলেই মৃত্যু। দিক-দিশা তো এমনি হারাইয়া ফেলিয়াছি—ভালো করিয়াই হারাইব।

শেষরাত্রে চাঁদ উঠিলে দেখিলাম আমার পিছনের জঙ্গল খুব ঘন। এখানে ডিঙি বাঁধিতে ভরসা হয় না। কিন্তু উপায়ই বা কী? কী চমৎকার রূপ হইয়াছে সেই গভীর রাত্রে সেই ক্ষীণ চন্দ্রালোকিত অনন্ত সাগরের। দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিয়াও ফুরায় না। অদ্‌ভুত স্থানটি বটে। পিছনের জঙ্গলে বাঘের গর্জন দু-একবার কানে গেল। ভোরের দিকে ভাটার সঙ্গে আর এক সমূহ বিপদ; ঢেউ উত্তাল হইয়া উঠিয়া কূলে যেভাবে আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, তাহাতে ডিঙি বাঁচানো এক মহাসমস্যা। এখনি তো ঢেউয়ের আছাড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে—ডিঙি সামলাইতে গিয়া ডুবিয়া মরিব শেষে?

ডিঙি হইতে নামিয়া ডিঙির মুখ ধরিয়া বাহির-সমুদ্রের দিকে ফিরাইলাম। একমাত্র ভরসা সমুদ্রের মধ্যে ডাঙা হইতে দূরে যাওয়া। কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে লইয়া যাওয়া কি সোজা কথা? ভাটার টান অবশ্য খানিকটা সাহায্য করিতেছিল বটে। খানিক পরে মনে হইল সমুদ্রের নীচের কোনো সোঁতার মুখে পড়িয়া ডিঙি ক্রমাগত বাহিরের দিকেই চলিয়াছে। এ আবার আর এক বিপদ! কী করি উপায়? দু-বার নোনাজলের ঢেউ

আছড়াইয়া পড়িয়াছিল ডিঙির উপর। সেঁউতি দিয়া জল সেচিতেছিলাম। ডুবো সোঁতার অস্তিত্ব এতক্ষণ বুঝিতে পারি নাই। মস্ত কী এক শুশুকের মতো সামুদ্রিক জানোয়ার আমার সামনে জলে উলট-পালট খাইয়া গেল, আমি নিরুপায় অবস্থায় বসিয়া রহিলাম। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত আছি। সমুদ্রের কূল আর দেখা যায় না। সুন্দরবনের কালো রেখা কোথায় মিশিয়া গিয়াছে। সম্মুখে অনন্ত নীল জলরাশি। কোথায় চলিয়াছি? এবার সত্যই কি এ জীবন হইতে বিদায় লইবার দিন আসিয়া গিয়াছে?

দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চলিতেছি, সূর্যের অবস্থান দেখিয়া মনে হইল। তটরেখা অদৃশ্য হইয়াছে বহুক্ষণ। দক্ষিণ-মেরুর দিকে চলিয়াছি নাকি? ক্ষুধা অপেক্ষা তৃষ্ণা বেশি কষ্ট দিতেছিল। শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, ক্ষুধায় তত নয়–যতটা তৃষ্ণায়। সারাদিন কাটিয়া গেল। আবার সূর্যাস্ত দেখিলাম। আবার আকাশে নক্ষত্র উঠিল। মাথার উপর অগণিত নক্ষত্রখচিত আকাশ, নীচে অনন্ত সমুদ্র–মরণের আগে কী রূপই অনন্ত আমার চোখের সামনে খুলিয়া দিলেন! মরিব বটে কিন্তু কাহাকে বলিয়া যাইব যে কী দেখিয়া মরিলাম।

অনেক রাত্রে কোথায় যেন বাঁ-দিকে বুম বুম করিয়া কামানের আওয়াজের মতো কানে আসিল। অন্ধকারের মধ্যে চাহিয়া দেখিলাম। কিছু বুঝিতে পারিলাম না। শেষরাত্রে খুব শীত করিতে লাগিল।

বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। উঠিয়া দেখি ডিঙি সমুদ্রে স্থির হইয়া আছে। সূর্য অনেক দূর উঠিয়া গিয়াছে। চারিদিকের নীল জলরাশি চিকচিক করিতেছে খর-রোদে। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা বাড়িল। বিকালের দিকে মনে হইলআমার বহু দূরে ডান দিক দিয়া একখানা জাহাজ যাইতেছে। পরনের কাপড় খুলিয়া উড়াইয়া দিলাম, নাড়িতে লাগিলাম। তাহারা বুঝিতে পারিল না। অন্য দিকে চলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

কী কুক্ষণে কাল বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছি! মনুর জন্য বড়ো কষ্ট হইতেছিল। বার বার উহার কথা মনে হইতেছে–উহার কথা আর দুই মার কথা। বনবিবিতলার মার কথাও যে কতবার মনে হইল।

আবার রাত্রি আসিল। আবার নক্ষত্র উঠিল। সেই রাত্রে শেষে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম কী অজ্ঞান হইলাম, জানি না। পৃথিবী ও সমুদ্র সেরাত্রে সব মুছিয়া গেল।

জ্ঞান হইলে দেখি একটা কাঠের ঘরে শুইয়া আছি–কাঠের ঘর কী কাঠের বাক্স। আমার পাশে একজন চাটগাঁয়ের মুসলমান বসিয়া। সে বলিল সেখানকার বুলিতে, আমি সারিয়াছি কিনা। আমি বলিলাম–আমি কোথায়? একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি আসিয়া

আমার শিয়রে বসিল। তাহার দিকে চাহিয়া মনে হইল ইহাকে দেখিতে আমার বাবার মতো। আমার নাম জিজ্ঞাসা করিল, চাটগাঁয়ের ভাষায় আমি কেন এভাবে সমুদ্রে ভাসিতেছিলাম? সব খুলিয়া বলিলাম। চাহিয়া দেখিলাম চারিদিকে। একটি ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে আমি একটা কাঠের ঘরে শুইয়া আছি মনে হইল। উহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তাহারা চাটগাঁয়ের মুসলমান জেলে। এই গ্রাম কোনো স্থায়ী বাসিন্দার গ্রাম নয়। মাছ আর সামুদ্রিক ঝিনুক তুলিতে এখানে বৎসরে তিন মাস ইহারা আসিয়া বাস করে। ইহাদের সামপান (নৌকা) কূলের অদূরে সমুদ্রে আমার নৌকা দেখিতে পায়। তারপর এখানে আনে। আমি চার-পাঁচ দিনের মধ্যে সুস্থ হইয়া উঠিলাম। সামুদ্রিক মাছের ঝোল আর ভাত, এ ছাড়া আর কোনো খাদ্য সেখানে ছিল না। আমাকে তাহারা সঙ্গে লইয়া আর একটা দ্বীপে গেল, দ্বীপের নাম কুমড়াকাটা। সেখানে পাশাপাশি অনেকগুলি দ্বীপ আছে, সবগুলিই জনহীন, মৎস্যশিকারিরা মাঝে মাঝে বসতি স্থাপন করে আবার চলিয়া যায়। একটা দ্বীপের নাম চাঁদডুবি, একটার নাম সাহাজাদখালি। সব দ্বীপেই ভীষণ জঙ্গল। মিষ্ট জলের খাঁড়ি কেবল চাঁদডুবি ছাড়া অন্য কোনো দ্বীপে নাই বলিয়া আমরা সেখানে নৌকা লাগাইয়া মিষ্ট জলের সন্ধানে গেলাম। ডাঙায় উঠিয়া বাঁ-দিকে ছোটো একটা বালিয়াড়ি, তাহার পিছনে ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের গাছ আমি চিনিলাম না, শুধু কয়েক ঝাড় মূলী বাঁশ ছাড়া। এক-জাতীয় বড়ো গাছে রাঙা ফুল ফুটিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ওই গাছের নাম ছাপলাস গাছ। জঙ্গলের মধ্যে ছাপলাস আর মূলী বাঁশই বেশি। এই দ্বীপের সমুদ্রতীরে বালুকারাশির উপর কত ঝিনুক ও শাঁখের ছড়াছড়ি, তাহার একটু দূরে ঘন সবুজ বনভূমি, লতার ঝোপে কত কী অজানা বনপুষ্প। চাঁদডুবি দ্বীপটি স্বর্গের মতো সুন্দর।

একা কতক্ষণ দ্বীপের বালির চড়ায় বসিয়া থাকি। সারাদিন এমনি বসিয়া বসিয়া নীল সমুদ্রের গান যদি শুনিতে পাই তবে কোথাও যাইতে চাই না। এমন সুন্দর নামটি কে রাখিয়াছিল এ দ্বীপের?

বনবেণুকুঞ্জের মধ্যে পাখি ডাকে। কেহ শুনিবার নাই সে-পাখির কলকূজন। যাহারা এখানে আসে, তাহারা মাছ ধরিতে ব্যস্ত। পাখির ডাক শুনিবার কান তাহাদের নাই।

বামদিকের বাঁশবনের তলা দিয়া সঁড়িপথ মিষ্ট জলের খাঁড়ির দিকে চলিয়া গিয়াছে। জেলেদের পায়ে চলার চিহ্ন এ পথের সর্বত্র। আমি সে-পথে একা অনেক দূরে চলিয়া গেলাম। ঠিক যেন সুন্দরবনের একটি অংশ, তেমনি ঘন বন, তবে কেয়া গাছ ছাড়া সুন্দরবনের পরিচিত কোনো গাছ নাই। এক জায়গায় দেখি অনেক জংলি গোঁড়া লেবুর গাছ, যেন কে লেবুর বাগান করিয়া রাখিয়াছে। সুন্দরবনেও এ লেবুর জঙ্গল অনেক জায়গায় আছে।

জল লইয়া জেলেরা চলিয়া গেল। আমি এক জায়গায় লেবুবাগানের মধ্যে একটি আশ্চর্য দ্রব্য হঠাৎ আবিষ্কার করিলাম। সেটি একটি ছোটো কামান। এই কামানের গায়ে বাংলা অক্ষরে লেখা আছে কী সব কথা, পড়িতে পারিলাম না।

একজনকে ডাকিয়া বলিলাম– শোনো—

সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল–কী?

এটা কী?

দেখতেই পাচ্ছ কামান!

কী করে এল এখানে?

জানি নে।

জানতে ইচ্ছে করে না?

কী দরকার—

মিটিয়া গেল। ইহাদের কোনো কৌতূহল নাই কোনো বিষয়ে। আমার ইচ্ছা হইল কামানটা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই। কিন্তু অত ভারী জিনিস একা আমার সাধ্য নাই বহিবার। লোকটার সহিত অনিচ্ছার সহিত চলিয়া যাইতেছিলাম, এমনসময় সে এমন একটা কথা বলিল যাহাতে আমি থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলাম। সে বলিল–শুধু কি একটা কামান দেখছ বাবু, ওই জঙ্গলের মধ্যে গড় আছে, ভেঙে পড়ে আছে মস্ত গড়!

সে কী?

গড় মানে কেল্লা। এটাকে বলে চাঁদডুবির গড়। কত আশ্চর্য জিনিস এখানে ছিল, এখনও আছে। কত লোক কত টাকা পেয়েছে এখানে। গড়ের ইটের মধ্যে আমার গাঁয়ের এক বুড়ো লোক সোনার পাত আর আকবরি আমলের সোনার টাকা পেয়ে খুব বড়ো মানুষ হয়েছিল। তবে বাবু ওতে বিপদ আছে–

কী বিপদ?

বাবু, ওতে বংশ থাকে না।

বয়ে গেল!

www.bengaliebook.com

তুমি ছেলেমানুষ তাই এমন বলছ। বড়ো হলে আর বলবে না। তা ছাড়া—

তা ছাড়া কী?

অপদেবতার ভয়—

মানি না।

নেই বললেই সাপের বিষ চলে যায়? সন্ধ্যের পর তেষ্টায় গলা শুকিয়ে মরে গেলেও কেউ চাঁদডুবির খাঁড়িতে জল নিতে আসবে না।

বল কী?

তাই, তুমি যাকে হয় জিজ্ঞেস করে দেখো—

আমি যদি সন্ধ্যের পর এখানে থাকি?

প্রাণ একবার খোয়াতে বসেছিলে, আবার খোয়াবে। চলো, তোমাকে একটা গল্প বলব।

আমার কিন্তু ভূতের গল্প শুনিবার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। রাজবাড়ির ধ্বংসস্তূপ দেখিয়াছিলাম সুন্দরবনে, এখানে শুনিয়াছি কেল্লা আছে। কাহাদের এসব জিনিস? কাহারা এখানে কেল্লা বা রাজবাড়ি বানাইয়াছিল অতীত দিনে? কাহারা এখানে তাহাদের অতীত গৌরবদিনের চিহ্ন ফেলিয়া রাখিয়া অজানা পথে চলিয়া গেল? কে তাহারা? কী দিয়া ভাত খাইত তাহারা? কী ভাষায় কথা বলিত? কী করিয়া দিন কাটাইত? কী ভাবিত মনে মনে?

এইসব কথা আমাকে এখনই কেহ বুঝাইয়া বলিতে পারে?

এই সব আমি জানিতে চাই। কোনো অপদেবতার কাহিনি নয়–যাহা সত্য ঘটিয়াছিল, তাহাই জানিতে চাই, কোনো মনগড়া ঘটনা নয়। ডিঙিতে ফিরিয়া গিয়া বুড়ো মাঝি বদরুদ্দিনকে সব কথা বলিলাম। সে কি কিছু দেখিয়াছে। এখানে আরও কোনো দ্বীপে কি এমন আছে?

বদরুদ্দিন বলিল– সুন্দরবনে এমন কোনো কোনো জায়গায় আছে। এদিকের মধ্যে চাঁদডুবিতে আছে, আর সোনার দ্বীপে আছে। ওসব সেকেলে রাজাদের কান্ড সোনার মোহর পাওয়ার কথাও সত্যি। আমি নিজে একবার একখানা সেকেলে তলোয়ার পেয়েছিলাম, তলোয়ারখানার বাঁটে কত কী কাজ করা! আমার জামাই সেখানা নিয়ে

গিয়ে মহকুমার হাকিমকে দেখায়। তিনি বলেন–এখানা সেকালের দামি জিনিস–জাদুঘরে দিয়ে দাও। আমার জামাই তা দেয়নি, ফিরিয়ে নিয়ে আসে। এখনও আমার বাড়িতে আছে সেখানা।

সেখান হইতে আমরা আর একটি দ্বীপের কূলে চলিয়া গেলাম। জায়গাটির নাম ইদ্রিশখালির চর। এখানে বড়ো হাঙরের ভয়। জেলেরা কেহ জলে নামিতে সাহস করে না। দিগন্তরেখায় সূর্য উঠিতে দেখিয়াছি এখানে কত দিন। সমুদ্রের বুকে সূর্যোদয় কখনো দেখি নাই–শুনিলাম এখান হইতে এ দৃশ্য যেমন দেখা যায়, এমনআর এদিকে আর কোনো দ্বীপ হইতে দেখা যায় না।

এই সূর্যোদয় দেখিতে গিয়া একদিন বিপদে পড়িয়া গেলাম।

একটা ছোটো ডিঙি করিয়া কূল হইতে কিছুদূরে গিয়াছিলাম শেষরাত্রির দিকে। বৃদ্ধ বদরুদ্দিন আমাকে বলিয়াছিল–সমুদ্রের মধ্যে খানিকটা গিয়ে সূর্যোদয় দেখো বাবু।

কী যে সে অদ্‌ভুত দৃশ্য। জলের উপর একস্থানে একটা সরু আগুনের রেখা দেখা দিল প্রথমে। মনে হইল জলে আগুন লাগিয়াছে। পরক্ষণেই সূর্য হঠাৎ লাফাইয়া উঠিল যেন জলরাশির মধ্য হইতে একটা আগুনের গোলার মতো। তখনও সেটাকে সূর্য বলিয়া বোধ হইতেছিল না, একটা রঙিন ফানুস যেন জলের উপর কে উড়াইয়া দিয়াছে। বদরুদ্দিন ঠিকই বলিয়াছিল, ডাঙা হইতে এ শোভা দেখা যায় না।

এই পর্যন্ত ভাবিয়াছি, হঠাৎ দেখিলাম ডিঙিখানি কূল হইতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চলিয়াছে; ফিরাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। আবার কি চোরা সোঁতায় পড়িলাম? এই জিনিসটি বড়ো ভয়ের ব্যাপার এসব গভীর সমুদ্রে! মনু আমাকে অনেকবার বলিয়াছিল। বদরুদ্দিনও সেদিন বলিয়াছে। একবার নাকি উহারা এই চাঁদডুবি আর ইদ্রিশখালির মধ্যে কুমড়োবোঝাই একটা সামপান পায়। সামপানে তিনটি মৃতদেহ ছিল। দেখিয়া মনে হয়, তাহারা জল না খাইয়া মারা গিয়াছে। এ অবস্থায় লোকে সমুদ্রের জল পান করে, বেশি পরিমাণে সমুদ্রের জল পান করিলে পাগল হইয়া যায়।

বলিয়াছিলাম–পাগল হয় কেন?

তা জানি নে। মাথা খারাপ হয়ে যেতে দেখেছি বাবু।

তারপর? কোথাকার লোক ওরা?

বর্মাদেশের লোক বলে মনে হল। ঠিক বলতে পারব না। তারা কুমড়ো বোঝাই করে কোনো নদীপথে কিংবা দুটো দ্বীপের মাঝখানের সমুদ্রে নৌকো বাইতে বাইতে চোরা সোঁতায় পড়ে গিয়ে বার-সমুদ্রে চলে এসেছিল। তারপর যা হবার তাই হয়েছে। ওরা ডাঙার লোক ছিল নিশ্চয়, নইলে কুমড়ো আনবে কোথা থেকে? সামপানে কুমড়ো বোঝাই দিয়ে কেউ সমুদ্রে পাড়ি জমায় কি?

এইসব কথা আমার মনে পড়িল, আমি ঘর-পোড়া গোরু। এই সেদিন ডুবো সোঁতা হইতে মরিয়া যাইতে যাইতে বাঁচিয়াছি না নিজে? বদরুদ্দিন আমায় কী শিখাইবে?

যেমন একথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অমনি এক লাফ দিলাম ডিঙি হইতে। ভুলিয়া গেলাম যে সমুদ্র হাঙর-সংকুল ও অত্যন্ত বিপজ্জনক।

সাঁতরাইতে ভালোই জানিতাম, ডাঙাও খুব বেশি দূরে ছিল না। একটু হয়তো সাঁতরাইতে পারিব, ইহার বেশি হইলে আমার পক্ষে ডাঙায় উঠা সম্ভব হইবে না।

বেশ সাঁতরাইতেছি, হঠাৎ আমার নিকট হইতে হাত-ষোলো-সতেরো দূরে একটা চওড়া মাছের ডানা জলের উপর একবার ভাসিয়া পরক্ষণেই ডুবিয়া যাইতে দেখিয়া আমার হাত-পা অবশ হইয়া গেল। এ তো কোনো মাছের ডানা বলিয়া মনে হয় না। এ নিশ্চয় সামুদ্রিক হাঙরের ডানা! কামটের ডানা এত বড়ো হইবে না।

আবার সেই বড়ো ডানাটা ভাসিয়া উঠিল আমার নিকট হইতে আট-নয় হাত মাত্র দূরে। আমার মনে হইল যে করিয়াই হউক আমাকে এই ভীষণ জানোয়ারের হাত এড়াইতেই হইবে। একবার যদি ইহার হাতে পড়ি, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। এই সময় ডানাটা আবার ডুবিয়া গেল। এইবার বোধ হয় ইহা ভাসিয়া উঠিবে আমাকে মুখে শক্ত করিয়া কামড়াইয়া ধরিয়া। চট করিয়া বাঁ-দিকে ঘুরিয়া গেলাম এবং খুব চিৎকার করিতে লাগিলাম। এমন সময় ডানাটি ভাসিয়া উঠিল, ইতিপূর্বে এক সেকেণ্ড আগে আমি যেখানে ছিলাম সেখানে। এই সময় সেই ভীষণ-দর্শন সামুদ্রিক হাঙরের মুখটিও ভাসিয়া উঠিল, কিন্তু আমি যেদিকে আছি তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। হাঙরের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়াছে বুঝিলাম। কিন্তু এইবেলা যাহা করিতে পারি, বিলম্বে আর রক্ষা নাই। সঙ্গেসঙ্গে দুই হাত্তা সাঁতার দিয়া ডাঙার দিকে আসিতে চেষ্টা করিলাম। হঠাৎ আমার হাঁটুতে কে যেন শক্ত মুগুরের এক ঘা লাগাইল, জলের মধ্যে যেন পা-খানা কাটিয়া পড়িয়া গেল মনে হইল। দাঁতে দাঁত চাপিয়া তখনো সাঁতার দিতেছি–যাক একখানা পা, ডাঙায় উঠিতে না পারিলে সমস্ত দেহখানাই যে চলিয়া যাইবে।

এই সময় একটা বড়ো ঢেউ আসিয়া আমাকে ডাঙার দিকে হাতদশেক আগাইয়া দিয়া গেল। পরক্ষণেই দেখি আমি আবার অন্য দিকে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছি, কিন্তু

ডাঙাটা আর কোনোদিকেই দেখা যায় না। অনেক কষ্টে ডাঙার দিকে যদি-বা দু-হাত আসি, আবার চার হাত জলের মধ্যে চলিয়া যাই ডুবো সোঁতার টানে। এই জন্যই আমার ডিঙি বাহির-সমুদ্রে অতটা গিয়া পড়িয়াছিল, এইবার ভালো করিয়া বুঝিলাম।

আমার চিৎকার শুনিয়া দু-তিনজন আমাদের দলের জেলে ছুটিয়া আসিয়া আমাকে জল হইতে টানিয়া তুলিল। তখন আমি এমন অবসন্ন যে উহাদের কথার জবাব পর্যন্ত দিতে পারিলাম না। তাহারা বার বার বলিতে লাগিল, খুব বাঁচিয়া গিয়াছি। সেই সমুদ্রে পড়িয়া সাঁতার দেওয়া যে কী জিনিস তাহা যে জানে না, তাহাকে বলিয়া লাভ কী?

আমি বলিলাম–জানি হে জানি। আমাকেও ছাড়েনি, হাঙরে তাড়া করেছিল। উহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিল–কক্ষনো হয় না। রাগের সহিত বলিলাম–কী হয় না? তাহারা বলিল–কক্ষনো বাঁচতে পারে না হাঙরের মুখ থেকে– আলবৎ বেঁচেছি। আমার পাশে চার হাত তফাতে ওর ডানা লেগেছিল, ওর মুখও দেখেছি।

ডানা? হাঙরের নয়।

নিশ্চয় হাঙরের।

বদরুদ্দিন সব শুনিয়া বলিল–বাবু, ওরা ঠিক বলেছে। হাঙর ওভাবে একবার জাগবে একবার ভাসবে না–হাঁ করে তাড়া করে এসে কামড়ে ধরবে, ও হাঙর নয়।

কী তবে ওটা?

ওটা মহাশির মাছ, হাঙরের মতো দেখতে, মুখও অনেকটা হাঙরের মতো।

আমি প্রথমটা বিশ্বাস করি নাই। বদরুদ্দিন বলিল– ও মাছ তোমাকে দেখাবো, আমাদের আড়তে চলো—

কোথায়?

তার নাম কাছিমখালি। একটা ছোটো দ্বীপ।

আর কে আছে সেখানে?

কেউ না। শুধু আমরাই থাকি।

কী হয় সেখানে?

গেলেই দেখবে।

চাঁদডুবির মতো সুন্দর জায়গা?

মন্দ নয়।

একদিন কাছিমখালি দ্বীপে আমরা গিয়া নোঙর করিলাম। এখানে খড় দিয়া ইহারা ছোটো ছোটো ঘর তৈয়ারি করিয়াছে। অকূল সমুদ্রের ধারে বাঁশের লম্বা আলনা ও বন্য লতা টাঙানো আলনা। মাছের রাশি এখানে রৌদ্রে শুকাইবার জন্যই এই আলনার ব্যাপার। শুঁটকি মাছের দুর্গন্ধে সমুদ্রতীরের বাতাস ভারাক্রান্ত।

খাদ্যও এখানে শুধু মাছ ও ভাত। না ডাল, না কোনো তরকারি। বেশিদিন কাঁচা তরকারি না খাইলে নাকি একপ্রকার রোগ হয়, সেজন্য বদরুদ্দিন সেদিন আমাকে লইয়া নিকটবর্তী আর একটি দ্বীপে গেল। সেখানে বনের ছায়ায় ছায়ায় একরকম শাক গজায়, দু-জনে তাহাই তুলিয়া নৌকার খোলে জমা করিলাম। শাকগুলির পাতা অবিকল থানকুনি পাতার মতো– কিন্তু আমরুল শাকের মতো টক।

এখানে এক ব্যাপার ঘটিল।

আমি শাক তুলিতে তুলিতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছি, বদরুদ্দিন ডিঙিতে তামাক সাজিতে গিয়াছে, এমন সময় দেখি একজন বৃদ্ধ আমার দিকে আসিতেছেন। দু-মিনিটের মধ্যে বৃদ্ধটি আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া আমার দিকে অতি স্নেহপূর্ণ করুণ দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন। ঠিক যেন আমার দাদামহাশয়। একবার অতি অল্প সময়ের জন্য মনে হইল আমার সেই দাদামহাশয় আমার সন্ধানে বাহির হইয়া এখানে আসিয়া বুঝি পৌঁছিয়াছেন। আমার মন কেমন করিয়া উঠিল আমার দাদামহাশয়ের জন্য।

কিন্তু না, এই বৃদ্ধের রং আমার দাদামহাশয়ের চেয়ে সামান্য একটু কালো। সাদা দাড়িটিও বেশি লম্বা। পরনের কাপড় অতি ছিন্নভিন্ন ও মলিন। আমার দিকে খানিকটা চাহিয়া চাহিয়া বলেন–বাঙালি?

উত্তর দিলাম–আজ্ঞে হাঁ।

কোথায় বাড়ি?

অনেক দূর।

এখানে কী করে এলে?

মাছ ধরতে এসেছি কাছিমখালি। এখানে শাক তুলতে এসেছি।

হিন্দু না মুসলমান?

হিন্দু।

তোমার সঙ্গী কই?

তামাক সাজতে গিয়েছে ডিঙিতে। আপনি কে?

আমিও বাঙালি হিন্দু! আমি এখানে থাকি।

এখানে?

কেন, এ জায়গা কি খারাপ?

না, তা বলিনি। খুব চমৎকার জায়গা। কিন্তু এখানে আপনি কী করেন?

ব্যাবসা করি।

আমি অবাক হইয়া বৃদ্ধের স্নেহকোমল মুখের দিকে চাহিয়া থাকি। লোকটি পাগল নাকি? মুখ ও চোখের ভাবে কিন্তু পাগল বলিয়া তো মনে হয় না। তবে এমন আবোল-তাবোল বলিতেছেন কেন? আমার চোখের বিস্ময়ের দৃষ্টি বৃদ্ধ বুঝিতে পারিলেন! বলিলেন–বিশ্বাস হয় না?

এখানে কীসের ব্যাবসা?

এসো আমার সঙ্গে। কাউকে কিছু বোলো না। তোমার সঙ্গী কোথায়?

সে এখন আসবে না। তামাক খেয়ে নাইবে সমুদ্রে, বলে গিয়েছে।

সে হিন্দু না মুসলমান?

মুসলমান।

আমাকে খেতে দেবে সে?

www.bengaliebook.com

খাবেন? নিশ্চয়ই। আমি নিজে আনছি।

সেজন্যে নয়, আমি সকলের হাতেই খাই। কী আছে?

চিঁড়ে খাবেন?

উঃ, কতদিন চোখে দেখিনি! কিন্তু শোনো, এখন থাক। আগে চলো আমার সঙ্গে। তোমাকে দেখাই আগে, কেউ এসে পড়বার আগে। বড় গোপন জিনিস কিনা!

আমার খানিকটা ভয় না হইল এমন নয়। অদ্‌ভুত-দর্শন বৃদ্ধের সঙ্গে এই সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে কি আমার যাওয়া উচিত? কিন্তু ভয় বা কীসের? আমি নবীন যুবক। আমার সঙ্গে শরীরের শক্তিতে এই বৃদ্ধ কতক্ষণ যুঝিবেন?

গেলাম উহার সঙ্গে।

কিছুদূর গিয়া একটা বনের পিছনে পাতা-লতার একটি কুটির দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম। বৃদ্ধ আমাকে কুটিরের সামনে লইয়া গেলেন। আমি বলিলাম–চারিদিকে এত কচ্ছপের খোলা কেন?

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন–ওই আমার ব্যাবসা।

কী ব্যাবসা?

কচ্ছপের খোলার।

এখানে কচ্ছপ ধরেন কী করে?

এখানকার নাম কাছিমখালির চর। এখানকার সব দ্বীপের চরে সমুদ্র থেকে বড়ো কচ্ছপ উঠে রোদ পোয়ায়, ডিমে তা দেয়। তোক তো নেই কোনো দিকে!

কী করে ধরেন?

উলটে দিলেই হল। আর নড়তে পারে না।

তারপর?

তারপর ওদের কাটি। মাংস খাই, ডিম খাই, আর কাছিমের খোলা বিক্রি করি। লোকে নৌকো করে এসে জমানো খোলা কিনে নিয়ে যায়। ওরাই চাল দিয়ে যায়। অনেক দিন

আসেনি, চাল ফুরিয়ে গিয়েছে, শুধু কাছিমের মাংস খেয়ে ভালো লাগে না–তাও আজ তিন দিন একটা কাছিমও ডাঙায় ওঠেনি।

আমার সঙ্গে দেখা না হলে কী খেতেন?

কেন? ঝিনুক?

ঝিনুক!

খুব ভালো খেতে ওর শাঁসটা। তোমাকে খাওয়াব, এসো ঘরের মধ্যে এসো।

কুটিরের মধ্যে ঢুকিলাম। একটি ছিন্ন খেজুরপাতার চাটাই একপাশে পাতা, তাহার উপরে একটি ছেঁড়া বালিশ। একটি ঝকঝকে মাজা কাঁসার জামবাটি ছাড়া অন্য কোনো মূল্যবান জিনিস নাই ঘরের মধ্যে? একটি তিরধনুক ঘরের এক কোণে হেলানো। খাবার জলের জন্য একটি মাটির কলসি, তাও কানা-ভাঙা। অতি গরিব লোকের ঘরে ইহার চেয়ে অনেক বেশি জিনিস থাকে। আমি খুব অবাক হইয়া চারিদিকে দেখিতেছি দেখিয়া বৃদ্ধ বলিলেন–ভাবছ কী করে থাকি, না? তা নয় বাবা, বেশ থাকি।

সত্যি?

ঠিক তাই। খুব ভালো থাকি। কোনো মানুষ আমার নিন্দে করবে না, আমিও কারো নিন্দে করব না। মানুষ যেন কখনো মানুষের নিন্দে না করে। ওটা আমি সব চেয়ে অপছন্দ করি।

কি?

কেউ কারো নিন্দে করা। এখানে বেশ আছি।

কী করে দিন কাটান আপনি এখানে?

বৃদ্ধ হাসিয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দূরে সমুদ্রের নীল জলরাশির দিকে চাহিয়া চাহিয়া কী যেন ভাবিলেন। আমার সে সময় মনে হইল, ইনি অতি অদ্‌ভুত ব্যক্তি। হঁহার মতো মানুষ আমি এই প্রথম দেখিতেছি। হঁহার আগে যেসব মানুষ দেখিয়াছি তাহারা যে ধরনের, ইনি অন্য ধাতের মানুষ উহাদের থেকে। ইহার মতো চোখের দৃষ্টি তো কাহারও দেখি নাই এ পর্যন্ত।

আমিও কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন–দিন এখানে বড়ো সুন্দর কাটে, বুঝলে? এত সুন্দর কাটে যে আমি এ জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চাইনে!

কী করেন সারাদিন?

সারাদিন বসে থাকি।

বসে?

ওই সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসে!

তারপর হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন–আরে না না, তা ঠিক নয়। আমাকে তো খেতে হবে। কাছিমকে চিত করিয়ে দিয়ে তার মাংস কাটি–একটা বড়ো কাজ না? ঝিনুক কুড়োই বালুর চর থেকে। বড়ো একটা কাজ। শাঁস ছাড়াই–বড়ো একটা কাজ–কী বল?

আমিও হাসিতে লাগিলাম। না, বৃদ্ধ যেন শিশুর মতো সরল। আমার বড়ো ভালো লাগে। আমার দাদামহাশয়ের মতোই বটে। মনে হইল যেন ইনি আমার বহুদিনের পরিচিত।

উনি বললেন–তুমি ভাবছ, কেমন করে থাকেন? এ দ্বীপের রূপ দিনের মধ্যে এতবার বদলায়! যত দেখবে তত আরও দেখতে ইচ্ছে হবে। দেখে দেখে বুদ্ধি ফুরোয়। ভালো কথা, আজ সন্ধ্যের সময় সূর্য অস্ত যাওয়াটা একবার এ দ্বীপের একটা জায়গা থেকে দেখো তো! একটা গাছ আছে, তার ওপর আমি চড়ে থাকি। তোমাকেও চড়াব। দেখলে মোহিত হয়ে যাবে।

আমি দেখেছি।

কী দেখেছ?

উদয় ও অস্ত দুই-ই। আমি বার-দরিয়ায় হারিয়ে গিয়েই তো এখানে এসেছি। সে সময় নৌকায় বসে তিন দিন তিন রাত আমি দেখেছি।

তা হলে তুমি বুঝতে পারবে। সবই তো জান। এ জিনিস অনেকেই দেখতে পায় না। এমন দ্বীপ না হলে এ-রকমটি তো দেখা যায় না। দাঁড়াও, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই।

বৃদ্ধ উঠিয়া গিয়া ঘরের কোণ হইতে একটা ছেঁড়া নেকড়ার পুঁটুলি আনিয়া আমার সামনে খুলিয়া বলিলেন–এই দেখো। আমি বিস্ময়ে অবাক হইয়া বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিলাম– এ কী! এ যে অতি সুন্দর অনেকগুলো মুক্তা। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার অত্যন্ত বড়ো বড়ো। সবসুদ্ধ গুনিয়া দেখিলাম–ছাব্বিশটা মুক্তা। পাঁচটি খুব বড়ো ও খুবই সুন্দর। আমি জীবনে কখনো এক জায়গায় এত মুক্তা দেখি নাই।

বৃদ্ধ বিজয়ীর গর্বভরে বলিলেন–সব কিন্তু ঝিনুক থেকে সংগ্রহ করেছি। শাঁস খাব বলে ঝিনুক কাটতে গিয়ে এই সব পেয়েছি।

কত দিনে?

দু-বছরে তিন বছরে।

আপনি কাছিমের খোলা বিক্রি করেন, মুক্ত বেচেন না?

না। কাউকে দেখাই না। অনেক টাকার মাল। টাকা হলে মনে অহংকার আসবে, বিলাসের ইচ্ছা আসবে–এমন সুন্দর জায়গা থেকে হবে চিরনির্বাসন।

আপনার মুক্তো কত টাকার?

বলো?

আমি ছেলেমানুষ, কী জানি বলুন!

বললে বিশ্বাস করবে?

আপনি বললে ঠিক বিশ্বাস হবে।

যদি বলি দু-লাখ টাকার ওপর?

আমি চমকিয়া উঠিলাম, দু-লাখ! আমি হাজার দুই তিনেক-এর কথা ভাবিয়াছিলাম। ধারণা আমার মাথার মধ্যেই নাই। এ কী আশ্চর্য ধরনের বৃদ্ধ তাহা জানি না। এই খেজুর-চাটাইয়ে শোন, ভাঙা কলসিতে জলপান করেন, খান কাছিমের মাংস ও ঝিনুকের শাঁস–এদিকে উঁহার ভাঙা কুঁড়েঘরে দু-লাখ টাকার মুক্তা অবহেলায় এক কোণে মাকড়সার জালে ঢাকা পড়িয়া রহিয়াছে। আমাকে নির্বাক দেখিয়া বৃদ্ধ বলিলেন–কী? বিশ্বাস হল না?

তা না, বিশ্বাস হয়েছে। আপনি অদ্‌ভুত লোক।

কিছু অদ্‌ভুত না। আমার দরকার থাকলে আজ বড়োমানুষ হতাম। শহরে বাড়ি করতাম। জুড়িগাড়ি করতাম। আমার দরকার নেই।

সংসারে আপনার কেউ নেই?

সবাই আছে।

তাদের টাকা দিয়ে দিন। তাদের দরকার আছে। কত গরিব লোক আছে, তাদের দিয়ে দিন।

তুমি এসেছ খুব ভালো। এখানে থাকো। সে মুসলমান মাঝিকে আমি বুঝিয়ে বলব।দু জনে এখানে থাকি, রাজি?

রাজি।

ঝিনুকের শাঁস খেয়ে থাকতে হবে।

আমি আপনার মুক্তো চাই না, আপনাকে আমার ভালো লেগেছে, আপনার কাছে থাকব।

বৃদ্ধ বদরুদ্দিনকে আমি সব বলিলাম। অবশ্য মুক্তার কথা বাদে। সে আমাকে অনেক নিষেধ করিল। ওই বৃদ্ধ উন্মাদ, উহাকে সবাই জানে, আজ অনেকদিন ধরিয়া এই দ্বীপে আছেন একা কচ্ছপের খোলার ব্যাবসা করেন, তাহাও শোনা গিয়াছে। উহার সঙ্গে থাকিয়া কী লাভ? অবশেষে আমার দৃঢ়তা দেখিয়া চলিয়া গেল। বলিল, সে আবার আসিবে। যদি কোনো অসুবিধা হয়, সে আসিয়া লইয়া যাইবে।

সেই হইতে আমার এক নতুন জীবন আরম্ভ হইল।

দুই মাস কাটিয়া বর্ষা নামিল। এখানে বর্ষাটা বড়ো বেশি। দিনরাতের মধ্যে বিরাম নাই। বৃদ্ধকে ঘরের বাহির হইতে দিই না। জেলেদের সঙ্গে থাকিয়া মাছ ধরিবার পদ্ধতি শিখিয়াছিলাম। নানা রকমের সামুদ্রিক মাছ ধরি। ঝিনুকের শাঁস আমি বড়ো একটা খাই না। বৃদ্ধও আমার কাজে খুব সন্তুষ্ট। ভালো মাছ ধরিয়া বৃদ্ধকে রান্না করিয়া খাওয়াই। ঝিনুক কুড়াইয়া আনি। একদিন বৃদ্ধ আমাকে আরও দু-টি লুকোনো মুক্তা দেখাইলেন। মস্ত বড়ো দুইটি মুক্তা। বলিলেন–দাম জান? বলো তো? চোদ্দো হাজারের কম নয়! তুমি বিশ্বাস করো?

এসব সময় মনে হয় বৃদ্ধ বোধ হয় কিছু মাথা-খারাপ হইবেন। আমার অবিশ্বাসে কী আসে যায়? কেনই-বা উনি এত টাকা এখানে নির্জন বালুচরে পুঁতিয়া রাখিয়াছেন? জগতের কত না উপকার হইতে পারিত এ টাকার দ্বারা?

বলিলাম–দাদু আমাকে একদিন মুক্তোর ঝিনুক দেখান না?

বেশ, চিনিয়ে দেব। সবসময় কি পাওয়া যায়। কালেভদ্রে।

তবে এতগুলো কী করে পেলেন?

একদিন তোমাকে বলব।

আমি ছাড়িবার পাত্র নই। তাঁহাকে চাপিয়া ধরিলাম, না এখনি বলিতে হইবে। এতগুলি মুক্ত কীরূপে পাইলেন?

বৃদ্ধ বলিলেন–মুক্তোর ঝিনুক এখানেই পাওয়া যায়। সেইজন্যেই আমি তো বলছি, চিনিয়ে দেব।

এখুনি দিন।

এসো আমার সঙ্গে।

তারপর দ্বীপের উত্তর-পূর্ব-কোণে একটা সম্পূর্ণ নিভৃত স্থানে আমাকে লইয়া গিয়া একটা গাছের তলায় বসাইলেন। সে-স্থানে একরাশি ঝিনুক ছিল। আমায় বলিলেন–এর নীচের সমুদ্রে একটা পাহাড় আছে জলের তলায়। সেই পাহাড়ের গায়ে লেপটিয়ে থাকে যেসব ঝিনুক–সবগুলিই প্রায় মুক্তগর্ভা ঝিনুক।

সব?

এক-শোটার মধ্যে সাত-আটটা।

এই হল আপনার সব?

ওরই নাম সব। ওই বেশি। ডুব দিয়ে পাহাড়ের গা থেকে ওগুলো তুলতে হয়। হাঙরের ভয় এখানকার জলে। একটু সাবধান হতে হয়। চলো তোমায় দেখিয়ে দিই।

একটা গাছের নীচের পথ দিয়া আমরা সোজা নামিয়া আসি সমুদ্রের বালুতটে। জলে নামিয়া হঠাৎ বামদিকে এককোমর জলে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ বলিলেন–এসো। সোজা চলো

দশ পা। তারপর ডুব দিলেই পাহাড়। আমি বৃদ্ধের কথামতো সেখানটাতে ডুব দিয়া দেখিলাম ছোটো পাথরের একটা চড়া সেখানটাতে আছে বটে। ডুব দিয়া পাথরের গা হইতে আমি আট-দশটা ঝিনুক তুলিয়া আনিলাম। উত্তেজনার মাথায় সেগুলি তখনই ভাঙিয়া ফেলিলাম ডাঙায় বসিয়া। কিছুই নাই। আমার হতাশা দেখিয়া বৃদ্ধ বলিলেন– সারাদিন তুলে যদি একটা মুক্তোও পাওয়া যায় তা হলে যথেষ্ট হয়েছে বিবেচনা করবে। এ কাজে বড়ো পরিশ্রম।

তা তো দেখছি। তাতে ভয় কী?

আমি রোজ ঝিনুক খেতাম, মুক্তো হত বাড়তি।

কত দিনে কত পেতেন? মাসে কত পেতেন?

দশ হাজার টাকার মাল।

তবে কাছিমের খোলার ব্যবসা করেন কেন?

আমি কোনো ব্যাবসাই করি না।

না?

ঠিক। সেসব তুমি ছেলেমানুষ, বুঝবে না। ভোলা দিলে চাল-ডাল পাই।

মুক্তো দিলে তো অনেক চাল-ডাল-টাকা পান।

তাহলে আমার শান্তি নষ্ট হবে, ডাকাতের হাতে প্রাণও যেতে পারে। এখনজানে সবাই গরিব মানুষ–সকলে দয়া করে। পাগল ভেবে করুণাও করে। কিন্তু আজ যদি তারা জানে। আমি মুক্তোর মালিক, এই বদরুদ্দিনের দলই আমায় খুন করবে।

সে-কথা ঠিক।

আমার দরকার নেই অর্থের। বেশ আছি।

আপনার না থাকে, দেশের বহু ভালো কাজ হয় এই অগাধ টাকায়। হাসপাতাল হয়, স্কুল হয়, গরিব ছেলেদের লেখাপড়া হয়।

সব বুঝি। সময় হলে করব একদিন।

আমি সব সহ্য করিলাম এইখানে। এই নির্জনতা, এই খাওয়ার কষ্ট, এইগাছতলায় দিন রাত্রি কাটানো। আমার অত্যন্ত ভালো লাগিল বৃদ্ধকে। কুবেরের মতো ধনী মানুষ আজ এই ব্যক্তি। কীসের আশায় এই নির্জন দ্বীপে কাছিমের মাংস আর ঝিনুকের শাঁস খাইয়া কাল কাটাইতেছেন? কতবার জিজ্ঞাসা করি, কোনো স্পষ্ট উত্তর পাই না। এমন আশ্চর্য নিস্পৃহ মন! আমাকে গোপনীয় মুক্তার ভাঁড়ার দেখাইয়া দিয়া এমন নিশ্চিন্ত থাকেন কী করিয়া। আমি চুরি করিতে পারি তো? অন্য কোথাও লুকাইয়া রাখিতে পারি। যেখানে-সেখানে এত টাকার মুক্তা ফেলিয়া রাখিয়া একবার খোঁজও করেন না।

একদিন আমি বলিলাম–আমাকে এত বিশ্বাস করলেন কী করে?

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন–কেন?

আমি মুক্তো নিতে পারি নে ভাবছেন?

নাও তো নেবে।

আপনি কিছু ভাববেন না?

কেন ভাবব, নিও।

বেশ।

সত্যি বলছি, তোমার দরকার থাকে নিও।

দাদু, আমার কিছু দরকার নেই। আপনি আমাকে নিজের কাছে রাখুন, এই আমার দরকার।

থাকবেই তো।

কিছুদিন ধরিয়া দাদুর কাছে থাকিয়া এটুকু বুঝিলাম, এমন অদ্‌ভুত ও অসাধারণ ধরনের লোক সদাসর্বদা দেখা যায় না। শরীরে বা মনে কোনো বিলাস নাই। অথচমনে সর্বদা আনন্দ। এই খাইয়া ও এভাবে থাকিয়া কী করিয়া একটা লোক এত আনন্দ পাইতে পারেন, আমার মাথায় আসে না। দাদু আমাকে সারাদিন লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন–মুখে মুখেই সব। সমুদ্রে জোয়ারভাটা কেন হয়, গ্রহনক্ষত্র কী, কত রকমের ঝিনুক আছে, কতগুলো সমুদ্র আছে পৃথিবীতে, পৃথিবীটাই বা কী–নিত্যনতুন শিক্ষার আনন্দে আমার মন মাতিয়া গেল। কত যত্নে কত স্নেহের সঙ্গে দাদু আমাকে সব কথা বুঝাইয়া বলেন, কত ধৈর্যের সঙ্গে বার বার বুঝাইয়া দেন। বর্ষা

কাটিয়া শরৎ পড়িয়া গেল। সমুদ্র শান্ত হইল। সেদিন সমুদ্রের ধারে বসিয়া দাদু আমাকে দেশের অতীত ইতিহাস বলিতেছিলেন, আমি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম–দাদু, একটা কথা বলব?

কী বলো?

আপনি কোন জেলার লোক? কেন এখানে এলেন?

দাদু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সমুদ্রের দিকে চাহিলেন, বলিলেন–আমি একজন সাধারণ লোক, ব্যস!

না, ওসব শুনব না। খুলে বলুন, কেন এখানে এলেন?

আমার নাম কালীবর রায়, আমি বরিশাল কোটালিপাড়ার সিদ্ধেশ্বর তর্কাচার্যের সেজো ছেলে। আমি সংসার করিনি, বাবা আমাকে দেখে বাল্যেই নাকি বলেছিলেন–এ ছেলে সংসার করবে না। বাবা ও মায়ের মৃত্যুর পর দেশ ছেড়ে বহু তীর্থ বহু দেশ যাই। সেখান থেকে একদল মাঝির সঙ্গে এখানে এসে পড়ি ঘটনাচক্রে। বেশ লেগে গেল এর নির্জনতা আর এর চমৎকার দৃশ্য। সে তো তোমায় দেখিয়ে আসছি রোজ এত দিন ধরে। তবুও ফুরিয়ে যায় না, এমনি মজা। সেই থেকেই রয়ে গেলাম এবং আছি এবং থাকব। টাকার মালিক হয়ে আর অশান্তির সৃষ্টি করতে চাই না। বেশ সুখে আছি।

দাদুর মুখে তাঁহার জীবনের ইতিহাস শুনিয়া আমার কেবলই মনে হইতেছিল, ঝিনুকের মধ্যে বড়ো মুক্তার সন্ধান পাইয়াছি। অন্য কোনো ঐশ্বর্যে আমার দরকার কী? ইহার পদতলে বসিয়া কত শিখিতে পারি, কত জানিতে পারি। সারাজীবন ধরিয়া শিখিলেও ফুরাইবে না।

দাদু আমাকে সেই প্রথম দিনটি হইতে বড়ো স্নেহ করিতেন। কত গল্প বলিতেন, কত উপদেশ দিতেন। তাঁহার একটি অমূল্য উপদেশ–সময় কখনো নষ্ট করিতে নাই।

খুব সাধারণ কথা বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু এত বড়ো উপদেশ আমার জীবনে আমি শুনি নাই।

একদিন বলিলাম–দাদু, একবার দেশে যাবার বড়ো ইচ্ছে করে, কিন্তু আপনাকে ছেড়ে যেতে মন সরে না।

যাও না, ঘুরে এসো। আমি তো এখানেই আছি। এবার বদরুদ্দিনের নৌকো এলে ওদের সঙ্গে যেও।

আবার আসব কিন্তু।

বা রে, তুমি না এলে আমারও কী কষ্ট কম হবে?

এই কথাবার্তার পর বহুদিন কোনো নৌকো আসিল না। সে বোধ হয় আমার সৌভাগ্যবশতই। অমন মহাপুরুষের সঙ্গ পাওয়া কি অতই সস্তা?

ঋতুপরিবর্তনের অপূর্ব রূপ সেবার সমুদ্রের উপর প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ হইল। বিরাট আকাশের রং পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিরাট সমুদ্রের রং বদলাইল। সমুদ্রও যেন আকাশের দর্পণ। আকাশে মৌসুমি হাওয়ায় ঘন বর্ষার মেঘ জমিবার সঙ্গেসঙ্গে সমুদ্রের রং ঘষা পয়সার মতো হইয়া গেল। বৃষ্টি-ঝরা ঘন বর্ষার মেঘপুঞ্জের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দাদু সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি করিতেন। কোনো নাকি এক বড়ো কবি, নাম তাঁহার কালিদাস, তিনি আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে মেঘরাশির ছন্দ কাব্যে গাঁথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আমি মূর্খ, সংস্কৃত জানি না। দাদু মস্ত বড়ো পন্ডিতের সন্তান। আমাকে সুর করিয়া সংস্কৃত কবিতার ছন্দলালিত্য যখন বুঝাইতেন, পেছনে বহিত অনন্ত নীল সাগর, মাথার উপরে মেঘভারাক্রান্ত নভঃস্থল– যেন কোনো নতুন দেশের, নতুন জীবনের সন্ধান পাইলাম। এতদিনে। সমস্ত টাকাকড়ির স্বপ্ন যাহার নিকট তুচ্ছ হইয়া যায়।

বদরুদ্দিন মাঝি আসিল!

দাদু বলিলেন–কী দাদু, চললে সত্যি?

আপনি যা বলেন।

যাও, দেশ থেকে ঘুরে এসো।

ঠিক আসব।

আমার শিষ্য করে নেব তোমাকে।

আমি শুধু আপনার এখানে থাকতে চাই।

আমার কি অনিচ্ছে? দেশে অনেকদিন যাওনি, ঘুরে এসো।

যাইবার আগের দিন সন্ধ্যার সময় দাদু আমাকে সমুদ্রের ধারে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, দাদু সাবধানে থেকো। আবার এসো। একটা কথা–

কী?

কী নেবে বলো?

কী নেব?

যা ইচ্ছে, মুক্তো নিয়ে যাও।

একথা ভেবে বলব।

ভাবার কী আছে এর মধ্যে?

আপনার শিষ্য কি বৃথা হয়েছি? ভেবে দেখব, তবে বলব।

একা একা বিস্তীর্ণ বালুতটে দাঁড়াইয়া কত কী ভাবিলাম। দাদুর মুক্তা লইব। দাদুকিছুই বলিবেন না জানি, যত খুশি লইতে পারি বটে, কিন্তু বেশি টাকা হাতে পাইলে আমি শান্তি পাইব না। তবে দাদুর স্নেহের উপহারস্বরূপ, তাঁহার মলিন স্মৃতির চিহ্ন হিসেবে একটি মাত্র মুক্তা তাঁহার হাত হইতে গ্রহণ করিব।

দাদু পরদিন বলিলেন– কী নেবে?

কিছুই না, কেবল একটা মুক্তো নেব আপনার হাত থেকে।

খুব বিস্মিত হলাম। তুমি ছেলেমানুষ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সোজা কথা নয়। অনেক বড়ো বড়ো লোক পারে না। আশীর্বাদ করি, মানুষ হও।

মানুষ হও মানে বড়োলোক হও না তো?

টাকার বড়োলোক না,–এসো—

দাদা একটা পুঁটুলি খুলিয়া একটি মুক্তা আমার হাতে দিলেন। পুঁটুলিটি ঘরের এক কোণে অযত্নে পড়িয়াছিল। মুক্তাটি কখনো দেখি নাই, দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। বলিলাম–এ দিলেন কেন?

দাদু স্নেহবিগলিত কণ্ঠে বলিলেন–আমার সাধ এটা। নিয়ে যাও—

বদরুদ্দিনের নৌকাতে উঠিবার সময় তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় দিলাম। তাঁহার চোখে জলের মতো ও কী চিকচিক করিতেছে। অনেক দূর হইতে দেখি, তিনি ছবির মতো সমুদ্রবেলায় দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে আমাদের নৌকার দিকে চাহিয়া আছেন।

.

বাড়ি ফিরিয়া যাহা শুনিলাম তাহাতে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। মা নাই, দাদামহাশয় আছেন বটে, কিন্তু একেবারে শয্যাশায়ী, শরীর জীর্ণ-শীর্ণ, অস্থিকঙ্কালসার। আমাকে হারাইয়া দারুণ দুঃখে মৃতপ্রায়।

এই দীর্ঘ সাত বৎসরে আমার চেহারায় অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল, তবু দেখিবামাত্র কষ্টে গাত্রোত্থান করিয়া দাদু রে আমার বলিয়া দাদামহাশয় আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, আমার প্রত্যাগমনের পর হইতে তিনি ক্রমশ সুস্থ হইয়া উঠিলেন, হাতে পায়ে বল পাইলেন।

একদিন তাঁহাকে প্রথম হইতে আমার সমস্ত ঘটনা বসিয়া বসিয়া বলিলাম! দাদুর কথা শুনিয়া দাদামহাশয় দু-হাত জোড় করিয়া বার বার তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন।

বলিলাম–দাঁড়ান, একটা জিনিস দেখাই।

পরে মুক্তাটি বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিলাম। দাদামহাশয় বৈষয়িক ব্যক্তি, মুক্তা চিনিতেন। বিস্ময়ে তাঁহার চোখ বড়ো বড়ো হইয়া উঠিল। বলিলেন–এ কী, কে দিলেন, তিনি?

হ্যাঁ।

এর দাম কত তোমার আন্দাজ হয়?

জানি নে।

অন্তত বিশ হাজার টাকা। এ নিয়ে একটা ব্যাবসা করো দাদু। আমি সব ঠিক করে দেবো।

আপনি যা বলেন।

সত্যি বড়োলোকের দেখা পেয়েছিলে!

দাদামহাশয়কে ছাড়িয়া যাইতে পারিলাম না কোথাও। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মায়া হইত। আমাকে পুনরায় হারাইলে বৃদ্ধ এবার আর বাঁচিবেন না।

ব্যাবসা করিতেছি, উন্নতিও হইয়াছে। বৎসর খানেক কাটিয়াছে। নির্জন দ্বীপের আমার সেই দাদুকে কখনো ভুলি নাই, তাঁহার সেই ছবির মতো মূর্তিটি মনের পটে চিরদিন অক্ষয় হইয়া থাকিবে। জানি না আবার কবে দেখা হইবে!

মাঝে মাঝে রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে দেখি তিনি বলিতেছেন–দাদু, মানুষ হও, সময় কখনো নষ্ট কোরো না–কথাটা ছোটো, কিন্তু মস্ত বড়ড়া উপদেশ জীবনের পক্ষে।

স্বপ্নের মধ্যেই বলি–আপনি আশীর্বাদ করুন।

সেই সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপটি, সেই নীল জলরাশি, সেই চিত-করানো কচ্ছপগুলো আবার যেন চোখের সামনে তখন ফুটিয়া উঠে।